কমলপত্র

ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ)

২০২৩

কমল পত্র

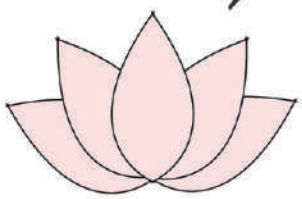

ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ)

প্রার্থনা

ॐ सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्वि नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

রক্ষিত হোক গুরু শিষ্য দুইজন সমভাবে
জ্ঞান শক্তি সমান ভাবে ঔজ্জ্বল্য পাবে,
হে ব্রহ্ম, গুরু শিষ্য দুজনে যেন পারি
বিদ্যাফল লাভে হতে সম অধিকারী
প্রজ্ঞা-বলে তেজস্বী আর সম উদ্বোধিত,
ঈর্ষা যেন কলঙ্কিত করেনা দোঁহে, পিতঃ

O God—
May knowledge permeate and protect both of us (teacher and disciple)
in equal measure.
May both of us enjoy the fruits of knowledge in equal measure.
May our acquired knowledge be imbued with spirit and valour and
invigorate both of us in equal measure.
May there never be any malice between us.

ম্যাগাজিন কমিটি

ড. মৈত্রেয়ী রায় কাঞ্জিলাল (অধ্যক্ষা)

ড. ঊমা রায় শ্রীনিবাসন

ড. ইন্দ্রাণী চক্রবর্ত্তী

ড. ফারহাত আরা কাহেকাশা

ড. পর্ণশবরী ভট্টাচার্য

ড. অনুরাধা বসু

ড. দেবযানী দাস ঘোষ

ড. কস্তুরী মজুমদার

ড. শ্রাবণী পাল

ড. মধুমিতা বসু

ড. শুচিস্মিতা খাঁড়া

ড. প্রকৃতি দাস

ড. ঈশিতা সাহা

শ্রী নন্দন সাহা

শ্রী আদিত্য সরকার

ছবি : অনন্যা নস্কর ● সেমিস্টার-১ ● ইংরাজী (অনার্স)

FROM THE PRINCIPAL'S DESK

I am delighted to address you all through the pages of our esteemed College Magazine, "Kamal Patra". This edition is particularly special as the name it bears draws inspiration from the name of our founders' residence "Kamal Kutir", a space that nurtured audacious dreams of women's empowerment. "Kamal Patra" serves as a tribute to the visionary ideals of our founders, Brahmananda Keshab Chandra Sen and his daughters, Maharani Suniti Devi and Maharani Sucharu Devi. Their indomitable spirit envisioned an educational experience that would empower women to navigate the complexities of the world with wisdom, compassion and resilience.

This edition is a celebration of diverse talents and passions that make our College truly exceptional. The thoughtfully curated contents of this volume showcases the immense creativity, intellect and passion that thrives within our college community. Each article, poem, short story, travelogue and artwork represents the journey, struggles and triumphs of our contributors.

I commend the hard work and dedication of students and faculty involved in putting this Magazine together. Their collective efforts have given voice to the diverse perspectives, talents and aspiration of our vibrant academic family. I congratulate Dr. Indrani Chakraborty and the editorial team of faculty members in their stupendous efforts to bring out this issue.

This magazine is a reminder of our collaborative vigour, the power of our voices and the boundless possibilities that lie ahead. I have no doubt that our college will continue to thrive with our students leading the way as compassionate leaders and agents of change. Like the 'Komol' or the Lotus flower, our students would bloom with grace amidst myriad impediments.

May this be just the beginning of an incredible journey, as we continue to inspire and encourage one another. Wishing you all an enriching and fulfilling reading experience.

With warm regards,
Dr. Maitreyi Ray Kanjilal
Principal
Victoria Institution (College)

প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষার কলমে

সুনির্বাচিত, পূর্বনির্ধারিত নামকরণের একটা বিশেষ সুবিধা হল এই যে সেই নামটি সবসময়ই মূখ্য বিষয়ের অর্থাৎ কিনা মর্মস্থলের সূচক হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক নন্দন সাহার মনোনীত কলেজ ম্যাগাজিন এর নামটি 'কমল পত্র' সেই কারণেই আমাদের সকলের পছন্দ।

সম্পাদিকা, অধ্যাপিকা ড. ইন্দ্রাণী চক্রবর্ত্তী, সেটা সুন্দর করে তুলে ধরেছেন তাঁর সম্পাদকীয় কলমে।

মহারাণী সুনীতি দেবী তাঁর বাবার ইচ্ছাপূরণের জন্য, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বসত বাড়িটি কিনে নিয়ে তার বড় অংশটাই তাঁর স্বপ্নের ইনস্টিটিউশনকে দান করেছিলেন। ভাবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে বড় রূপ দেওয়ার পরিকল্পনার কাছে কিছু স্বার্থত্যাগ তো অবধারিত হয়ে ওঠেই। কমল কুটীরের পদ্মফুলে ভরা পুকুরের জায়গায় তৈরী হল স্কুল-কলেজের কেশব মেমোরিয়াল হল। সেখানেই আজ অনুষ্ঠিত হয় স্কুল-কলেজের সব অনুষ্ঠান।

"কমল পত্র"—নামটি ভারী মমতা মাখানো; সেই পুরনো স্মৃতি আমাদের ফিরিয়ে দেয়। হয়তো কোন এক সুদূর ভবিষ্যতে আমরা আবার সংস্কার সাধন করে সেই পদ্মফুলে ভরা, পদ্মের সৌরভে মন মাতানো কমল-কুটীর-প্রাঙ্গণ ফিরিয়ে দিয়ে মহারাণী সুনীতি দেবীর মহান ঋণ আংশিক পূর্ণ করতে পারব। স্বপ্নের সৌধই তো সব সৃষ্টির গোড়ার কথা।

আমাদের ছাত্রীদের লেখায়-ছবিতে-ভাবনায় সাজানো, অধ্যাপকদের সংযোজনে সমৃদ্ধ কমল পত্রের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হল। আশা করি পাঠকদের মনের খোরাক কমল পত্রের দুই মলাটের মাঝে ভরে দিতে পেরেছি আমরা।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা
ড. উমা রায় শ্রীনিবাসন

সম্পাদকীয়

কমল পত্র, আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনের এই নামটিই আমাদের যথাযোগ্য মনে হয়েছে। কারণ প্রায় শতাব্দী ছুঁই-ছুঁই এই কলেজ-ভবনটির নাম 'কমল কুটীর'। দক্ষিণ এশীয় নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা পুরুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতি-বিজড়িত বাসগৃহ এই কমল কুটীর। কেশবচন্দ্র এই ভবন কিনেছিলেন মিস্ পিগট নামের এক মহিলার কাছ থেকে, তখন নাম ছিল "লিলি কটেজ"।

লিলি কটেজের নামানুসারেই হলো কমলকুটীর। ভবনটির ভেতরের প্রাঙ্গণে ছিল একটি ছোট্ট পুকুর, এখন যেখানে কেশব মেমোরিয়াল হল, ঠিক তার সামনে। আর পুকুর ভরে থাকতো পদ্ম ফুলে।

কেশব সেনের জন্মদিনের সকালে শ্বেতপদ্ম হাতে ছাত্রী-শিক্ষিকা সবাই প্রভাতফেরী করে এসে পৌঁছতো কমল কুটীরে।

তাই আমাদের ছাত্রীরা তাদের প্রতিভার প্রথম আঁচড় কাটুক 'কমল পত্র'-এ। এমনই বাসনা আমাদের। নামটি দিয়েছেন অধ্যাপক নন্দন সাহা। গৃহীত হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে।

'কমল পত্র'-এর শেষ প্রচ্ছদের ছবি, মাঝের পাতার ছবি—সবই ছাত্রীদের আঁকা। আছে কবিতা, বাংলা, ইংরেজী ও উর্দুতে। কবিতার সঙ্গে রয়েছে ছাত্রীদের আঁকা একগুচ্ছ ছবি। রয়েছে গল্প, বাংলা ও ইংরেজীতে, রয়েছে কলেজের প্রথম দিনের স্মৃতি ছাত্রীর কলমে। আছে একটি বিশেষ কলম যাঁরা স্মরণীয়। দুই স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের ছবি এঁকেছে দুই ছাত্রী। তাঁদের বিষয়ে লিখেছেন দুই অধ্যাপক।

আরেকটি বিশেষ কলমে রয়েছে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের একগুচ্ছ ছাত্রীর শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিষয়ে তাৎক্ষণিক অনুভবের সুন্দর প্রকাশ বাংলা ও ইংরেজীতে।

উর্দু বিভাগে তসনিম তনভির একটি নিবন্ধে লিখেছে ব্যক্তির জীবনে শিক্ষকের গুরুত্ব।

সেবা খাতুন মর্মস্পর্শী একটি রচনায় ব্যক্ত করেছে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক। ছোট একটি কবিতায় রামশে আফতাব ফিরে গেছে শৈশবের স্মৃতিমেদুরতায়। ফেরদৌস ইয়াসমিনের নিবন্ধের বিষয় ঈদ-উল-ফেতর।

আতিয়ার কবিতা—রিস্তা। রাজি রেশমি-র কবিতা—আতিয়া, যার অর্থ ঈশ্বরের দান; যাতে রেশমি জানিয়েছে, কন্যা-সন্তান প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের দান। করোনা ভাইরাসের ওপরও একটি কবিতা লিখেছেন অধ্যাপিকা ফরিদা আনোয়ার।

অধ্যাপিকা নিখত জাহান লিখেছেন ফৈজ আহমেদ ফৈজের জীবনেতিহাস। অধ্যাপিকা ফারহাত আরা কাহেকাশা ফৈজ আহমেদ ফৈজের কবিতায় দার্শনিক ও নান্দনিক আবেদনের বিচারমূলক মূল্যায়ন করেছেন।

ছাত্রীদের সঙ্গে কলম ধরেছেন অধ্যাপকরাও, কারণ এ তো আমাদেরও কমলপত্র। আমাদের কমল কুটীরের মুখপত্র।

আমাদের রচনা-কুসুমগুলি সাজিয়ে দিলাম কমল পত্র পুটে।

ড. ইন্দ্রাণী চক্রবর্ত্তী
বাংলা বিভাগ

সূচীপত্র

অধ্যক্ষার কলমে	ড. মৈত্রেয়ী রায় কাঞ্জিলাল	৭
প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষার কলমে	ড. উমা রায় শ্রীনিবাসন	৯
সম্পাদকীয়	ড. ইন্দ্রাণী চক্রবর্ত্তী	১০

কবিতাগুচ্ছ

প্রার্থনা	সুধৃতি রায়	১৩
স্মৃতিরা জোনাকি	দুর্গা রায়	১৪
অগ্নিগর্ভে কন্যা আমার	মন্দিরা সাহা	১৫
LETS GLOW	Sweta Biswas	48
HOME	Anisha Ghosh	49
AGAINST	Aryama Bhattacharya	50
AMOROUS CORPSES	Sudipta Poddar	53
LA MASCARADA	Aindrila Chakraborty	54
FADE AWAY	Abhilasha Parui	55
REMEMBERING OF...	Sweta Biswas	56
LENSES SMOGGY	Aryama Bhattacharya	57
LESS THEN A DREAM : AN ESSENCE	Ipsita Paul	58

গল্প

চিরতরে	স্নেহা বসাক	১৬
শক্তিমান	সুচন্দা সাহা	২০
আজব স্বপ্ন	স্বর্ণলী নায়েক	২১
Efforts	Debasmita Saha	39
A Reconnection	Pradipta Mallick	42
Roopkotha	Bidisha Chakraborty	44
You too ?	Bidisha Chakraborty	46

স্মৃতিকথা

কলেজের প্রথম দিনটা	অভীষ্টা দাস	২২

প্রবন্ধ

নারী শিক্ষার প্রসারে ব্রাহ্ম সভার আচার্যদের ভূমিকা	আদিত্য সরকার	২৩

স্মরণীয় যাঁরা

এপিজে কালাম ঃ এক স্বপ্ন উড়ান	নন্দন সাহা	২৫
"A thing of beauty is a joy for ever	Sananda Laha	35

শিক্ষামূলক ভ্রমণ (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ)

নয়নকথা	অন্তিমা পাল	২৭
আমার নৈনিতাল ও করবেট ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	এসা গায়েন	২৯
Excursion এর অভিজ্ঞতা	জুলেখা আনজুম	৩০
A Memorable Excursion	Suchismita Das	36
An Excursion	Ankita Chatterjee	38

ভ্রমণ কথা

এক ছুট্টে লুলং	প্রকৃতি দাস	৩২

প্রচ্ছদ আত্রেয়ী পাল

প্রার্থনা

সুধৃতি রায়
ইতিহাস বিভাগ ● ষষ্ঠ সেমিস্টার

পালমোনারির গহীন অন্তরালে
প্রশ্বাসময় স্বপ্নের যাতায়াত
এই আমাদের দেহতত্ত্বের গান
এই-ই আমাদের অবিস্মর আয়াত

সেরিব্রামের জটিল অন্ত্যটিকায়
গালিব, শক্তি, মীরের জায়গা হোক
এই আমাদের হ্যালেলুইয়ার সুর
এই-ই আমাদের অর্হৎ-উপসথ

অলিন্দ আর নিলয়ের কারুকাজে
অনন্ত প্রেম জাগিয়ে তুলুক প্রাণ
এই আমাদের একান্ন সতিপীঠ
এই-ই আমাদের মারাংবুরুর থান

আশায় মোড়ানো একটা সুতোর জোরেই
মুছে যাক সব গড়ে তোলা বিচ্ছেদ
এই আমাদের প্রার্থনা, দর্শন
এই-ই আমাদের রবীন্দ্রনাথ চান।

ছবি : নিকিতা ● তৃতীয় সেমিস্টার ● ইংরেজী সাম্মানিক

স্মৃতিরা জোনাকি

দুর্গা রায়
বি-কম অনার্স ● ৫ম সেমিস্টার

বারবার ফিরে যাই অজানার খোঁজে
ঝিনুকের বুকে মুক্তার ব্যথা দোলে
আড়াআড়ি চলে পুরনো সে কথকতা
ব্যথার আঘাত ব্যথার তুফান তোলে
আনাচে কানাচে পদ্মরা পাতে আড়ি,
সবুজ শ্যাওলা নাকি জল রং শাড়ি।
ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসে পুরনো সে ভালোবাসা,
চোখের পাতায় থেকে যায় কিছু লেখা
নিভু নিভু হয় দীপের প্রজ্জ্বলিকা,
অশ্রুতে ধোওয়া হারানো দিনের কথা
শৈশব-স্মৃতি মধুভরা কথকতা।

ছবি : সুচরিতা চৌধুরী ● ১ম সেমিস্টার ● ইংরেজী সাম্মানিক

অগ্নিগর্ভে কন্যা আমার

মন্দিরা সাহা
বাংলা বিভাগ ● ৬ষ্ঠ সেমিস্টার

একশো মানিক জ্বলে
হাজার ভিড়েও একলা সে মেয়ে
নিজের কথা বলে
অগ্নিগর্ভে সে মেয়েই আজ
আকাশ দিল পাড়ি
এক হাতে সে লড়ছে দেখ
অন্যতে ঘরবাড়ি
পথ যেন তাও আঁধার কোথাও,
বিকিয়ে নরম প্রাণ
পশুর হাতে মরছে তবু
দেয়নি নিজের মান
চার দেওয়ালের রংবাহারী
ঘৃণার পরশ মেখে
হাহাকারের রাত কেটে যায়
বিষের ব্যথা রেখে
সাইনা, মেরি হয়েই দেখো
কন্যা তুমি তন্বী
জিতছ রোজই জীবন খেলায়
দস্যি হয়েও ধন্যি
তাই বলি মেয়ে স্পর্ধা দেখা
লক্ষ্যে অচল হয়ে
অগ্নিগর্ভা কন্যা মা তুই
আগুন বুকে বয়ে।

চিরতরে

স্নেহা বসাক
বাংলা বিভাগ ● দ্বিতীয় সেমিস্টার

নির্ভয় টুকটাক লেখালেখি ভালোই পারে। তবে সেটা যে পেশাদারিভাবে করা যায় এই কথাটি নির্ভয় স্বপ্নেও ভাবেনি। আসলে ভাবতে পারেনি। খুব ছোটোবেলায় তার বাবা হৃদরোগে মারা যায়। তখন নির্ভয়ের 'বাবা' কি জিনিস সেটা বোঝার বয়সও হয়নি। মা একটা ছোটোদের স্কুলে পড়াতেন। মা তাকে ছোটোবেলা থেকেই সাহিত্যকে ভালোবাসতে শিখিয়ে ছিলেন। নির্ভয়ের এখনও মনে আছে মা ওকে সঞ্চয়িতা পড়ে ঘুম পাড়াতেন। সেও চেষ্টা করত মায়ের সাথে সাথে কবিতাগুলো আওড়াতে। তখন নির্ভয় বলতো — "এটা হবে না.....আমিও কেন তোমার মতো ওগুলো বলতে পারিনা?" মা হাসতেন আর বলতেন — "বড়ো হলে ঠিক পারবি।" নির্ভয় যখন ক্লাস সিক্স-এ উঠল তখন একদিন তাড়াহুড়োয় রাস্তা পেরোতে গিয়ে লরির সাথে ধাক্কা লেগে নির্ভয়ের মাও মারা যান। তখন থেকে নির্ভয় তার মামাবাড়িতে দাদান আর দিদানের কাছে মানুষ হয়েছে।

আস্তে আস্তে সমাজ তাকে বোঝাতে লাগলো তার জীবনের শুধুমাত্র একটাই লক্ষ্য — একটা বড়ো চাকরি করে দাদান আর দিদানকে দেখা। সেই তখন থেকেই নির্ভয় নিজের মধ্যে কেমন গুটিয়ে গেল, বন্ধুবান্ধব, খেলাধূলা, আড্ডা দেওয়া, প্রেম করা এসবের যেন তার কোনো অধিকার নেই। তবে লেখালেখিটাকে সে অনেক চেষ্টা করেও নিজের জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। আস্তে আস্তে সে স্কুলের গন্ডী পেরিয়ে কলেজে উঠল। নির্ভয়ের মাঝে মাঝে মনে হয় সে এক অনির্দিষ্ট জীবন দৌড়ের ময়দানে দৌড়ে চলেছে , একমুহূর্ত বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার সময়টুকুও তার নেই। সে যেন এক অজানা জীবন যুদ্ধে নেমেছে।

একদিন বন্ধুদের জোরাজুরিতে ফেসবুকে একটা পেজ খোলা হল। নাম দেওয়া হল 'মেসপিয়ন'। এর মাঝে নির্ভয় একটু সহজ হয়েছে। আজকাল মাঝে মাঝে তারও যেন ইচ্ছা করে আড্ডা দিতে, গান গাইতে, কবিতা লিখতে। পড়াশোনাও চলছে ভালোই। কলেজের স্যার-ম্যামেরাও তাকে উৎসাহিত করেন। এভাবে দেড় বছর কেটে গেল। এর মাঝে অনেক মেয়ের নির্ভয়কে পছন্দ হলেও কেউই নির্ভয়কে সাহস করে কিছু বলে উঠতে পারেনি। নির্ভয় লক্ষ্যও করেছে সেগুলো, কিন্তু ইচ্ছা করেই যেন সে এইসব এড়িয়ে চলে।

এইবার কলেজে নতুন ব্যাচ ঢুকলো। আনন্দে মেতে উঠলো কলেজ। তারই মাঝে একটি মেয়ে, নাম অনিন্দিতা। আজ সে বেশ ভয়ে ভয়েই আছে। সে বন্ধুদের থেকে শুনেছে কলেজে নাকি দাদা দিদিরা অনেক প্রশ্ন করেন আর সেগুলোর ঠিকঠাক উত্তর না দিতে পারলে শাস্তিও দেন, যাকে বলে র‍্যাগিং। অনিন্দিতা জড়োসড়ো হয়েই ঢুকছিল কলেজে। এত বড় ক্যাম্পাস, কিছুই তো বুঝতে পারছে না কোথায় যেতে হবে। হঠাৎ একটা ডাক

একটা লম্বা চওড়া ষন্ডা মার্কা ছেলে বলছে — এই যে, ফার্স্ট ইয়ার নাকি?

অনিন্দিতা বলে - হ্যাঁ...মানে ওই চিত্তরঞ্জন হলটা ঠিক কোন দিকে বুঝতে পারছি না.....

—ছেলেটা বলল - আরে, ওসব পরে হবে, আগে একটা গান শোনাও তো দেখি।

—ইয়ে মানে গান তো আমি....মানে ঠিক গাইতে পারি না...

—তাহলে কি পারো? নাচতে?

—না, মানে... আমি কবিতা বলতে পারি।

—তাহলে তাই শুরু করো....কুইক

প্রতি পূর্ণিমার মধ্যরাতে একবার
আকাশের দিকে তাকাই।
গৃহত্যাগী হবার মত জোছনা কি উঠেছে?

বালিকা ভুলানো জোছনা নয়,
যে জোছনায় বালিকারা ছাদের
রেলিং ধরে ছোটাছুটি করতে করতে বলবে,
হে মাগো! কি সুন্দর চাঁদ!

নব দম্পতির জোছনাও নয়,
যে জোছনা দেখে স্বামী গাঢ়
স্বরে স্ত্রীকে বলবে;
দেখো দেখো,
চাঁদটা তোমার মুখের মতই সুন্দর।

(ততক্ষণে নির্ভয় এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে, সে যেন মুগ্ধ হয়ে শুনছে...আরো বেশ কয়েকজন জড়ো হয়ে গেছে...প্রত্যেকে চুপটি করে শুনছে)

কাজলা দিদির স্যাঁতস্যাঁতে
জোছনা নয়,
যে জোছনা বাসি স্মৃতিপূর্ণ ডাস্টবিন উল্টে দেয়

আকাশে।

কবির জোছনা নয়,
যে জোছনা দেখে কবি বলবেন
কি আশ্চর্য রুপোর থালার মত চাঁদ।

আমি সিদ্ধার্থের মত
গৃহত্যাগী জোছনার জন্য বসে আছি।
যে জোছনা দেখা মাত্র গৃহের সমস্ত
দরজা খুলে যাবে।
ঘরের ভেতর ঢুকে পড়বে
বিস্তৃত প্রান্তর।

প্রান্তরে হাঁটব, হাঁটব আর হাঁটব।
পূর্ণিমার চাঁদ স্থির হয়ে থাকবে মধ্য আকাশে,
চারিদিক থেকে বিবিধ কণ্ঠ
ডাকবে...আয়, আয়, আয়।।"

প্রত্যেক কিছুক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে রইল অনিন্দিতার দিকে। সবাই যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। হঠাৎ করতালির রোল উঠল। সবার অসম্ভব ভালো লেগেছে। নির্ভয় হঠাৎ বলে উঠল —তুমি হুমায়ুন আহমেদ পড়ো?

অনিন্দিতা মাথা নাড়ল। তারপর সবাই অনিন্দিতার সাথে নানা কথা বলায় মেতে উঠল। অনিন্দিতা লক্ষ্য করল না নির্ভয় কখন সেখান থেকে চলে গেছে।

এখন কলেজে অনিন্দিতার অনেক বন্ধু হয়ে গেছে। বেশ কিছু . দাদা-দিদিদের সাথেও তার আলাপ আছে। এর মধ্যে একদিন রিতেশ দা (অর্থাৎ সেদিনকার ষন্ডা মার্কা ছেলেটা) কে অনিন্দিতা জিজ্ঞেস করল —

—আচ্ছা আমরা একসাথে এত মজা করি, গল্প করি...নির্ভয়দা কেন আমাদের সাথে এসব করে না?

—আসলে ও ছেটোবেলা থেকেই একটু চুপচাপ।

—তাই বলে একটা কথাও বলবে না? এ আবার কি ধরণের অভদ্রতা?

— না রে, আসলে ছোটোবেলা থেকেই ওর জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। তাই সবসময় নিজের চারপাশে একটা আবরণ ঘিরে রাখে।

— কেন? কি হয়েছিল নির্ভয়দার জীবনে... যদি আমায় বলা যায় তা হলে বল না।

— না বলার কিছু নেই...আচ্ছা দাঁড়া বলছি...

রিতেশ অনিন্দিতাকে পুরোটা খুলে বলে। তাদের তৈরী সেই ফেসবুক গ্রুপের কথাও বলে। অনিন্দিতা অবাক হয়ে যায়, বলে —

— মানে? যেই 'মেসপিয়ন' -এর লেখা পড়ে গত দেড় বছর ধরে আমি রীতিমত পাগল হয়ে গেছি, হন্যে হয়ে খুঁজেছি এই কবিতাগুলোর লেখককে, সে

আর কেউ নয়, আমাদের নির্ভয়দা?

ইতিমধ্যে নির্ভয়ের শরীরটা ঠিক ভালো যাচ্ছে না। হঠাৎ হঠাৎ খুব দুর্বল লাগে, মাথা ঘোরে। আগেরদিন তো পড়ার ঘরে কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল নির্ভয় নিজেও জানে না। একদিন দিদান আর দাদানের ঠেলায় ডাক্তার দেখাতে যায় নির্ভয়। ডাক্তারবাবু কিছু লক্ষণ বুঝে তাকে কিছু টেস্ট করতে দেন। আজকে রিপোর্ট আনতে যাওয়ার কথা। সে রিপোর্ট আনতে গেলে ডাক্তারবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেন বাড়ির লোক কেউ আছে কিনা, উনি তাঁদের সাথে একটু কথা বলতে চান। নির্ভয় বলে তার দিদান আর দাদান বৃদ্ধ হয়েছেন, বেশি হাঁটাচলা করতে পারেন না, যা বলার উনি যেন তাকেই বলেন, ডাক্তারবাবু বলেন —

— এইসব কতদিন ধরে হচ্ছে?

— বেশ কিছু দিন, এমনকি বেশ কিছু মাস ধরেই হচ্ছিল। আসলে পড়াশোনার চাপে ডাক্তার দেখানো হয়ে উঠছিল না।

— সে তো বুঝতেই পারছি...

— কেন কি হয়েছে আমার?

— যেহেতু আপনার বলার মতো আর কেউ নেই, তাই বাধ্য হয়ে আপনাকেই বলতে হচ্ছে... ব্রেন ক্যানসার, মোটামুটি Second কি Third stage তো হবেই। সেটা বোঝার জন্য আরো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।

এটা শোনার পর ও যে কিভাবে বাড়ি ফিরেছিল ওই জানে। ওর শুধু একটাই কথা মনে হচ্ছিল দাদান আর দিদানের কি হবে?

...এর মধ্যে বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। নির্ভয় দাদান কে সবটা জানিয়ে দিয়েছে। দাদান দিদানকে এখনই কিছু জানাননি কারণ এই শোক সামলে ওঠার মতো জোর দিদানের হয়তো আর নেই।

নির্ভয়দের কলেজের পাশেই গঙ্গার ঘাট আছে। সেখানে রোজই বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বসে থাকে অনিন্দিতা। আজ হঠাৎ অঝোরে বৃষ্টি। কলেজে বিশেষ কেউ আসেনি তাই। অনিন্দিতা একাই ঘাটে বসেছিল। সূর্যের কমলা রঙের আভা গঙ্গায় মিশে গিয়ে কি অপূর্ব জলছবি সৃষ্টি হয়েছে সেটাই একমনে দেখছিল অনিন্দিতা। হঠাৎ পায়ের আওয়াজে সম্বিত ফিরল তার। পিছনে এসে বসেছে নির্ভয়দা। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অনিন্দিতার মনে হল আজ, এখনই মোক্ষম সময়, নির্ভয়দার সাথে আজ ভালো করে কথা বলতেই হবে। সে উঠে এসে বসে নির্ভয়ের পাশে। বলে—

— তুমি বেশ কিছুদিন এখানে আসোনি তাই না?

— হ্যাঁ, সময়টা ভালো যাচ্ছে না আর কি... তবে তুই কি?

— না না, আমি তোমার উপর নজর রাখছি তা কিন্তু নয়, আমিও রোজই বসি এখানে বন্ধুদের সাথে...তখনই দেখতাম।

— তবে আমি তোকে কিন্তু বেশ নজরে রাখতাম, তোর বইয়ে মুখ গুঁজে থাকা, আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যাওয়া, বৃষ্টিতে ভেজা, কবিতা বলা এমনকি সেটা পড়তে পড়তে তোর মোটা চশমার ফাঁক দিয়ে মুক্তোর মতো খসে পড়া জল... আমি সব নজরে রাখতাম।

— অনিন্দিতা অবাক হয়ে শোনে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে -

— তুমি আর লিখবে না নির্ভয়দা? 'মেসপিয়ন' আর কতদিন সেই পুরোনো কবিতা আগলে পড়ে থাকবে?

— তুই তো সাইকোলজির স্টুডেন্ট না? মন বুঝতে পারিস মানুষের। আচ্ছা এতদিন তো আমায় দেখছিস, বলতো কিছু বুঝতে পারিস?

একটু যেন লজ্জা পায় অনিন্দিতা, তাও বলে

তুমি তো নিজেই কারোর সাথে বেশি মেশোনা.... সবসময় একটা আড়াল তৈরি করে রাখো নিজের চারপাশে। বুঝতেই তো দাওনা নিজেকে, তবে তোমার কবিতা পড়ে যা মনে হয়, তুমি খুব রহস্যময় একটা মানুষ, তোমার লেখা গভীর অথচ স্পষ্ট।

— হা হা হা, তাই বুঝি?

— বলো না নির্ভয়দা...তুমি আর লিখবে না?

— না রে, শুধু শুধু আরো কতগুলো মানুষকে মায়ায় বেঁধে লাভ কি বল? যেখানে আমি নিজেই হয়তো কয়েক মাস পরে সব মায়া ছেড়ে পালাবো।

— মানে?

— কিছুনা...আজ উঠি রে।

— না না, আগে বল তুমি এটা কেন বললে?

— (মুচকি হাসল নির্ভয়) আমি আর বেশি দিন নেই রে। মনে হয় খুব শিগগিরই বাবা-মার সাথে দেখা হবে...তাই মনটা বেশ ফুরফুরে আছে। তাই ভাবলাম একটু ঘাটে এসে বসি।

— কি? (চোখ ভরে জল আসে অনিন্দিতার) কি হয়েছে তোমার?

— ব্রেন ক্যানসার, লাস্ট স্টেজ। তবে মনে হয় এখনও মাসখানেক টেনে দেবো।

— কি বলছ এসব? এতোদিন কেন বলোনি? অন্তত সবাই মিলে একটা চেষ্টা তো করা যেতো...

—আর কিচ্ছু করার নেই অনি।

—কিন্তু আমি যে... আমি যে তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি নির্ভয়দা! তার কি কোনো মূল্য নেই।

— নাম দিস না অনি, নাম দিলে যে মায়া বড্ড বেড়ে যায়।

আজই শেষ দিন আমাদের দেখা হওয়ার। আমি কাল দাদান আর দিদানকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে যাচ্ছি রে, ওখানে অন্তত ওদের দেখভাল করার কিছু লোক থাকবে। কিছুই তো করে যেতে পারলাম না ওঁদের জন্য। আমার টিউশন পড়ানো আর মায়ের জমানো কিছু টাকা রেখে যাবো...। আশা করি তা দিয়ে কয়েক বছর চলে যাবে ওঁদের। তারপর আর কিছুই জানি না...

—কান্নায় গাল ভেসে যাচ্ছে অনিন্দিতার, শুধু অস্ফুটে বলে, একবার তোমায় জড়িয়ে ধরবো নির্ভয়দা? একবার?

নির্ভয় বুকে টেনে নেয় তার অনিকে। সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। যেন ওদের ওই শেষ মুহূর্তের সাক্ষী দিয়ে যেতে চায় সে।

হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চল যায় নির্ভয়। শুধু ফেলে যায় তার কবিতার খাতাটা...অনিন্দিতা শেষ পাতাটা খুলে দেখে রবি ঠাকুরের কটা লাইন —

ফিরিবার পথ নাহি;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবেনা চিনিতে আমায়
হে বন্ধু বিদায়।

দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেছে। এখন অনিন্দিতা একটা বড়ো কলেজের অধ্যাপিকা। এই কটা বছরে অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। নির্ভয় যেদিন অনিন্দিতাকে ঘাটে রেখে চলে গেছিল সেদিনই রাত্রে অনিন্দিতা, দাদান, দিদান সকলকে ছেড়ে বাবা-মায়ের কাছে চলে যায় নির্ভয়। দাদান আর দিদানকে অনিন্দিতা নিজের বাড়িতে এনেই রেখেছে। তাঁরাও অনিন্দিতাকে নিজের নাতনির মতোই দেখেন। কাল সেই অনির বিয়ে। আজ বিকেলে অনিন্দিতা তাদের কলেজের পাশের সেই ঘাটে এসে বসেছে। সূর্যটা ডুবছে। অনিন্দিতার চোখের কোণটা চিকচিক করে উঠল। এবার সে ঘাট থেকে উঠে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

শক্তিমান

সুচন্দা সাহা
বাংলা অনার্স ● পঞ্চম সেমিস্টার

বাঘাযতীন প্যাসেঞ্জার হাওড়া থেকে ছেড়ে ছিল। আমি জানালার ধারে সিটে বসেছি। এই ট্রেনগুলোর একদিকে সিঙ্গল সিট আর একদিকে লম্বা সিট। জানালার ধারের এই সিটটা খুব লোভনীয়। একা বসে বাইরের দৃশ্যাবলী উপভোগ করা যায়। সিটটা পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম। উলুবেড়িয়ায় ট্রেন থামতে এক ভদ্রলোক উঠলেন ক্রাচে ভর দিয়ে, একটা পা নেই, নকল পা। আমার সিট পেরিয়ে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। খুব রাগ হল। আর একটু দূরে যেতে পারলেন না। তাহলে বিবেকের দংশন একটু কম হত। সামনে একজন প্রতিবন্ধী মানুষ, দাঁড়িয়ে থাকলে মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করে।

আমি তখন বাইরের দৃশ্য দেখা বন্ধ করে আড়চোখে লোকটাকে দেখছি। মুখে একটা স্মিত হাসি। ক্রাচটা বাংকে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করে তাতেই ডুবে গেলেন।

মেচেদা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতেই একটা লোক সোজা আমার কাছে এসে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। দেখলাম ছ'টা আঙ্গুল।

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই বলল— 'আমি প্রতিবন্ধী, আমার সার্টিফিকেট আছে। আমার সিটটা ছেড়ে দিন। এটা প্রতিবন্ধীদের সিট।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সিটের মাথায়, স্পষ্ট করে লেখা—'রিজার্ভড ফর ডিসেব্‌ল্‌ পার্সন' যাহ্‌! বসার সময় নজরে পড়ে নি। এইসব প্যাসেঞ্জার ট্রেনে প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত সিট থাকে তা জানা ছিল না আমার।

আমি বললাম — 'আমি খেয়াল করিনি, ভুল হয়ে গেছে। তবে আপনাকে নয়, এই সিটটা ওঁকে দিতে হবে। উনি অনেকক্ষণ উঠে দাঁড়িয়ে আছেন।'

বলে সেই খোঁড়া ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলাম। তারপর সিট ছেড়ে ক্রাচওলা ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললাম—'আপনাকে সিটটা ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল আমার। এজন্য দুঃখিত আমি।'

ভদ্রলোক অবলীলায় বললেন 'না না আপনি ভুল করছেন, আমার একটা পা নেই ঠিকই কিন্তু আমি ডিসেব্‌ল্‌ নয়। আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি, আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।'

আমি বললাম—'কিন্তু আমার খারাপ লাগছে। খুব গিল্টি ফিল করছি।'

ভদ্রলোক দৃঢ়গলায় বললেন—'কেন? একটা পা না থাকলেও আমি কোনও অংশে দুর্বল নই। আপনি যা যা করেন আমিও সব কাজ করি। প্রতি বছর আমি এই এক পা নিয়েই ট্রেক করি। আমার খুব ইচ্ছা একদিন মাউন্ট এভারেস্টে ওঠার। আমার মতো বেশ কিছু মানুষ উঠেছেন। ট্রেনেই যদি দাঁড়াতে না পারি, তাহলে আমি এভারেস্ট জয় করব কী করে?' বলে ভদ্রলোক আবার ম্যাগাজিনে মন দিলেন। আমি দেখলাম, আমার সামনে এক পা নিয়েই অতীব শক্তিশালী একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। আমি দু'পা নিয়েও তাঁর চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী। অনেক দুর্বল। সেই শক্তিমান মানুষটির সামনে আমার মাথা শ্রদ্ধায় ঝুঁকে গেল। উপলব্ধি করলাম, শুধু শারীরিক শক্তি নয়, প্রয়োজন মানসিক শক্তিরও।

আজব স্বপ্ন

স্বর্ণলী নায়েক
ইতিহাস অনার্স ● তৃতীয় সেমিস্টার

সময়টা তখন ১৯শে মে, ২০২২ সাল। সারাদিনের বেশিরভাগ সময়টা কলেজে যেতে আসতে কেটে গিয়েছে। তারপর আবার সকালে ও বিকালে ট্রেনের সব যাত্রীর মধ্যে আমিও ধাক্কাধাক্কি সামলে বাড়ি ফিরেছি। স্বাভাবিকভাবে খুবই ক্লান্ত, সেই ক্লান্ত শরীর নিয়ে সেই দিন বাড়ি ফিরলো আবার আমার ভাই, বাবা ও মার সাথে একটু কেনাকাটা করতেও গিয়েছিলাম। সকলে ভাবতে পারে এই মে মাসে কী কারণে কেনাকাটা? কিন্তু আসল কারণ এই যে আমি আমার পরিবার ২২শে মে ঘুরতে যাচ্ছি, সেই জন্যে শেষ কেনাকাটা। বেড়াতে যাচ্ছি।

আমরা এবারে যাবো আমাদের সকলের প্রিয় জায়গা দার্জিলিঙে। কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরে আমার অবস্থা খুবই খারাপ। খুবই ক্লান্ত হয়ে খাবার খেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়েছি। তখন রাত সাড়ে ১০টা বেজে গেছে। অন্যদিন এতো তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাই না। গান শুনি, টিভি দেখি ইত্যাদি। কিন্তু সেই দিন ঘুমোতে গেলাম। সারাদিন কী কী হলো আর বেড়াতে যাব সব নিয়েছি কিনা, কত আনন্দ করব এই সব ভাবতে ভাবতে আমার ঘরের বড়ো জানলার দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ করে, হঠাৎ করেই বলতে পারবো না, বোঝাতেও পারবো না।

এই কথাটা লিখতেও আমার হাত ও পা কাঁপছে সারা শরীরের রক্ত যেন শীতল হয়ে যাচ্ছে। লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটা ভাবলেই খুব আতঙ্কিত লাগছে। হঠাৎই দেখি চারিদিকে যেন বড়ো বড়ো আগ্নেয়গিরি যার থেকে বিশাল বিশাল আগুনের গোলা বেরোতে থাকছে ক্রমাগত। তাছাড়া চারপাশে কালো পাহাড়। আর সবথেকে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি মানুষের মৃতদেহ। সারা শরীরে রক্ত, কোথাও হাড় দেখা যাচ্ছে। যা খুবলে খুবলে খাচ্ছে শকুন ও চিল। অন্যান্য শকুন ও চিল আকাশে ঘোরাফেরা করছে। আমি সেই দেখে ভয়ে পাগলের মতো দৌড়োচ্ছি দৌড়োচ্ছি। হঠাৎ এক পাথরের টুকরো পায়ে লেগে পড়ে গেলাম।

পড়লাম যেখানে তার পাশে দেখি শকুন বসে আছে। চারিদিকে তারা ঘিরে রেখেছে আমাকে। কোনোমতে আমি প্রাণ বাঁচিয়ে আবার দৌড়োচ্ছি। তারপর একটা গুহায় আশ্রয় নিলাম। ক্ষুধা, তৃষ্ণাও খুব কষ্ট, সারা শরীর যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড কষ্ট শরীরে। গুহায় এক কোণে বসে আছি।

বাইরে অন্ধকার নেমে গেছে। বুঝতে পারছিনা সময়টা কী! রাত না সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ কিছু সময় কেটে যাওয়ার পর কিছু শব্দ শুনতে পাই, এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম একজায়গায়। সেখানে গোল করে কয়েকজন মানবরূপী জন্তু এবং তারা আগুন জ্বালিয়ে বসে আছে। তারা সকলেই মানুষ খেকো প্রাণীর মতো আচরণ করছে। দেখতেও কুৎসিত, মানুষের মতো চেহারা মুখটা কিন্তু শিয়ালের মতো। সেই দৃশ্যগুলি সকলেই অনুমান করতে পারছো। এই দেখে আমি চিৎকার করে ফেলি, বোকার মতো। তারপর সেই জন্তুরা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সকলের হাতে আছে পাথর। খুব ধারালো আর বড়ো। আমি প্রচন্ড চিৎকার করে উঠি।

হঠাৎ করে আমি বিছানার থেকে পড়ে গেলাম এবং মা, বাবা, ভাই ছুটে এল। ওরা বলল কীরে! কী হলো! প্রচন্ড চিৎকার করলি কেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি আর ভাবছি এতক্ষণ যা ঘটনাগুলি ঘটল আসলে তা স্বপ্ন ছিল। কালকে কখন যে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টের-ই পাইনি। যাই হোক মা, বাবা ও ভাই আর বাড়ির সকলে এই সব ঘটনা শুনে হাসি ঠাট্টা করছিল আমাকে নিয়ে। এখনও এই ঘটনা শুনিয়ে আমাকে সকলে উত্তেজিত করে। আর বলে তুইই দেখতে পারিস এইসব "আজব স্বপ্ন।"

কলেজের প্রথম দিনটা

অভীষ্টা দাস

সেমিস্টার-ওয়ান ● গণিত অনার্স

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে 'রেজাল্ট কবে বেরোবে' এর পরবর্তী প্রধান আকর্ষণ 'কলেজ যাবো'। 'কলেজ যাবো' একটা উত্তেজনা, একা একা কলেজ যাবো একটা হঠাৎ পাওয়া স্বাধীনতার গন্ধ। পছন্দের সাবজেক্ট পাবো তো, অনার্স না পাস, কোন কলেজ ভালো এরপর ক্যারিয়ার ঠিক মতো এগোবে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি সিরিয়াস বিষয়গুলিকে খানিক উপেক্ষা করলে 'কলেজ যাবো' বেশ আনন্দের দুটো শব্দ।

ফর্ম ফিলাপ, ভর্তি এই সমস্ত কর্তব্য পালনের পর আমার জীবনে এলো ১৯ সেপ্টেম্বর 'প্রথম কলেজের দিনটা'। তবে হ্যাঁ মনে করার মতো 'সিনটা' নয় কারণ এখানে তো আর 'দাদা' নেই; কাজেই চন্দ্রবিন্দু যতই বলুক 'দাদা দিদি হাত ধরে সিঁড়িতেই বসে পড়ে' আমি ছন্দ মিলিয়ে একথা উচ্চারণ করতে পারব না। তবে আমি পশ্চিমবঙ্গে থাকি, আর পশ্চিমবঙ্গে 'দিদি'র জোর কম নাকি? তাই প্রথম দিন সম্ভাব্য 'র‍্যাগিং' অত্যাচার দ্বারা পীড়িত, আহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে কি না এই চিন্তায় চিন্তিত চিত্তে ধীর পায় অগ্রসর হলাম কলেজের ভিতর। দুজন দিদি দাঁড়িয়ে ছিলেন সহাস্য বদনে, কাছে ডেকে তারা প্রথম দিনের শুভেচ্ছা জানাল। জিজ্ঞাসা করতে বলে দিল 'কেশব হল' কোন দিকে। খানিক অবাক হলাম বটে।

একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া যাক্। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির ঐ দৃশ্যটা মনে আছে? হাল্লার বদমাইশ মন্ত্রী সুন্ডিতে গুপ্তচর পাঠিয়েছিল, সে ফিরে আসতে জিজ্ঞাসা করছে, 'যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম কীরকম দেখলে?' গুপ্তচর বলে, 'নেই মন্ত্রীমশাই'। একে একে মন্ত্রীমশাই জিজ্ঞাসা করতে থাকেন অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য, হাতি, উট; সবেতেই গুপ্তচর বলে 'নেই'। মন্ত্রী ব্যঙ্গ করে বলেন 'তবে তারা কী ঘোড়ার ঘাস কাটে?' গুপ্তচর উত্তর দেয়, 'অশ্বও নেই!' মন্ত্রীমশাই অট্টহাস্য করেন এবং প্রচন্ড আহ্লাদিত স্বরে বলেন, 'যুদ্ধের কোনো ব্যবস্থাই নেই!' তবে আছেটা কি শুনি?' গুপ্তচর মৃদু হেসে বলে, 'খেতে ফসল আছে, গাছে ফল আছে, ফুল আছে, পাখি আছে, দেশে সুখ আছে, শান্তি আছে, হাসি আছে।' পৃথিবীতে প্রজা বিক্ষোভ, যুদ্ধ, কৃষক বিদ্রোহ, শ্রমিক আন্দোলন যখন স্বাভাবিক ঘটনা 'সুন্ডি' তখন আমাদের সবার কাছে 'ইউটোপিয়া।'

আমার কলেজ ভিক্টোরিয়া সুন্ডি দেশের মতই দুর্লভ। এখানে র‍্যাগিং এর অত্যাচার আছে? ইউনিয়ন এর দর্প, বিক্ষোভ, শিক্ষক-শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অসভ্য আচরণ এসব আছে? নেই। 'ক্লাস করানো হয় না' এই প্রচলিত অভিযোগটুকুও আমার কলেজের সম্বন্ধে নেই। কলেজে কলেজে ছাত্রসমাজে-র সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকার সম্পর্কের অবনতি, ছাত্রদের মধ্যে অশোভন আচরণ; রাজনৈতিক হিংসা সহ যে সকল অসহিষ্ণুতার ছবি খবরে দেখা যায়, গর্ব করে বলতে পারি আমার কলেজের অধঃপতনে যাওয়া মূল্যবোধের কোনো চিহ্ন মাত্র নেই। বলা যায় বিশৃঙ্খলার কোনো ব্যবস্থাই নেই।

সবুজে ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে শান্তি আছে, বড়ো বড়ো গাছগুলো তে পাখি আছে, ছাত্রী- শিক্ষিকার সম্পর্কে শ্রদ্ধা আছে, শাসন আছে তার সাথে অনেকখানি ভালোবাসা মাখা আছে।

ভিক্টোরিয়া কলেজের ক্লাসরুমে শিক্ষার আলো জ্বলে।

শিক্ষাব্যবস্থার দুর্দিনেও এখানের পরিবেশ বিশুদ্ধ আছে জোর গলায় বলতে পারি আমরা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা নিকেতনটিতে ওনার শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা, আদর্শ এবং সংস্কারের মূল্যবোধ অক্ষত আছে। তাঁর কথা ধার করে বলি, 'দেশকে পীড়িত করে এমন সব মহামূলদের প্রতিকার হল শিক্ষা। শিক্ষা শুধু জাতির মেধার বিকাশ ও উন্নতিসাধন করে না তার চরিত্রকে শুদ্ধ করে।'

আশা রাখি, বিশ্বাস রাখি আগামী দিনের যাত্রাপথ আমাদের সবার আরও সুন্দর হবে।

নারী শিক্ষার প্রসারে ব্রাহ্ম সভার আচার্যদের ভূমিকা

আদিত্য সরকার ● সহকারী অধ্যাপক

ঊনিশ শতকে বাংলর সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে একাধিক সভা-সমিতি। যাদের হাত ধরে গড়ে ওঠে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন। এই পর্বে এসে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে অগ্রনি ভূমিকা নিয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজ। মধ্যযুগীয় সামাজিক অনুশাসন, সামাজিক শিক্ষার অভাব ও প্রগতিশীল চিন্তার মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসন এবং ব্রিটিশ শাসনাধীন ঘূণধরা সমাজকে বদলে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য লড়াই এর কাজটা কিন্তু খুব সহজ ছিল না।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে অত্যাচারী ও ব্যাভিচারী মহিষাসুরকে বধ করতে স্বর্গের সমস্ত দেবতাগণ আপন আপন শক্তিদিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন দেবী দুর্গাকে। সেদিন স্বর্গের দেবগণ নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য দেবী দুর্গার দশহাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন দশাস্ত্র। ঠিক তেমনি ব্রাহ্ম সমাজের চারজন মুখ্য ব্যক্তিত্ব তথা ব্রাহ্ম সমাজের চারজন আচার্য নারী মুক্তিকে তাঁদের জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসাবে ভাবতে শুরু করেন। এঁরা হলেন যথাক্রমে রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী। ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই চার ব্যক্তির চেষ্টায় বাংলার নারী সমাজ একদিকে শিক্ষার অধিকার পেতে শুরু করে অন্যদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করতে শুরু করে।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় ছিলেন প্রথম বাঙালি পুরুষ যিনি নারী শিক্ষার প্রসারতার জন্য কলম ধরেন এবং প্রকাশ্যে নারী শিক্ষার জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বলেন। ১৮১৪ সালে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এর ঠিক পরের বছর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আত্মীয় সভা। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা। 'এশিয়াটিক জার্নাল' এ বিষয়ে লিখেছিল, "এই সভায় বালবিধবাদের বাধ্যতামূলক বৈধব্যের বিরুদ্ধে, বহু বিবাহের ও সহমরণের তীব্র নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

রামমোহনের পূর্বে এদেশের আর কোনো মানুষ এমনভাবে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে সর্ব সন্মুখে এমন সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেননি। তাঁর হাত ধরে বিকশিত ব্রাহ্ম আন্দোলনের ছোঁয়ায় নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষার চিন্তায় কলকাতার সচেতন নাগরিক সমাজের মনন আলোড়িত হতে শুরু করে। রামমোহনের চেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নারীদের সমস্যার কথা তুলে ধরা প্রভৃতি কর্মকান্ড বাংলার নারী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে। ব্রাহ্ম সমাজের জন্য যে সব নীতি, আচরণ বিধি ও নিয়ম তৈরি হয়েছিল তার মাধ্যমেও রামমোহন নারী প্রগতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

ব্রাহ্ম আন্দোলন ভারত—ইতিহাসের আধুনিক পর্বের এক জীবন্ত সামাজিক আন্দোলন ছিল। রামমোহন-পরবর্তী ব্রাহ্ম আন্দোলনের মুখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। যদিও বহুদিন আগে থেকেই তাঁর পরিবার (ঠাকুর পরিবার) সামাজিক ক্ষেত্রে এক নতুন প্রবাহের সূচনা করেছিল। ব্রাহ্ম আন্দোলনে অংশগ্রহণের আগে থেকেই স্ত্রী-জাতির জন্য রামমোহনের সমাজ-সংস্কার-কেন্দ্রিক কাজের সাথে দেবেন্দ্র নাথের সংযোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্ম আন্দোলনের দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর কাছে নারীদের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন একটি কর্তব্য কর্ম হয়ে ওঠে। ১৮৪৯ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তায় বেথুন

স্কুল স্থাপিত হলে মহর্ষিদেব নিজ কন্যা সৌদামিনীকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তাছাড়াও তিনি পরিবারের মহিলাদের অন্তঃপুরে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। যার প্রভাবে পরবর্তীকালে ঠাকুর বাড়ির মেয়ে ও বউরা উচ্চশিক্ষা লাভ, সাহিত্য চর্চা ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। দেবেন্দ্র নাথ চেয়েছিলেন, ব্রাহ্মরা শুধু ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত না থেকে সমাজ সংস্কারের কাজের সঙ্গে যুক্ত হোক। তিনি মনে করতেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে গেলে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যুব সমাজকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখতেন, তা অনেকাংশে বাস্তবায়িত হয় ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগদান করলে। তারুণ্য ও আধুনিকতার যুগলবন্দীতে নারীদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর চিন্তা ভাবনা ছিল অনেক বেশি প্রগতিশীল। ১৮৬৪ সালে মেয়েদের জন্য ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর আচার্য। তাঁরই আগ্রহে নবীন ব্রাহ্মদের একটা অংশ নারী জাতির উন্নতির জন্য আপন স্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশ্য স্থানে যাতায়াত শুরু করেন। ১৮৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক অনুষ্ঠান মাঘোৎসবে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মিকা সমাজের মহিলারা উৎসবে যোগ দিতে চাইলে কেশব সেনের অনুরোধে দেবেন্দ্র নাথ পর্দার আড়ালে মহিলাদের বসবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রথম ব্রাহ্ম সমাজে মেয়েরা প্রকাশ্যে পুরুষদের সঙ্গে প্রার্থনা সভায় যোগ দিল। ১৮৭১ সালে ব্রাহ্ম সভার আচার্য থাকাকালীন তিনি নারী শিক্ষা প্রসারতার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন, Native Ladies Normal and Adult School. এই সময়ে শিক্ষায়িত্রী-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই নেটিভ স্কুলই কালক্রমে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ক্রমিক বিকাশের পথে ১৮৮৩ সালে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন নামে পরিচিত হয়। ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন ইংল্যান্ডে যান। সেখান থেকে দেশে ফেরার পর তিনি 'ভারত সংস্কার সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার কার্যাবলীর প্রথমেই ছিল স্ত্রী জাতির উন্নতিসাধন।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে উঠে ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। কেশব সেনের সময় থেকে ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হতে থাকে। ১৮৭৮ সালের মে মাসে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নাম নিয়ে নতুন এক সমাজ গঠিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী এই সমাজের প্রথম আচার্য নিযুক্ত হন। নতুন এই সমাজের প্রধান মুখ হিসাবে তিনি সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন ভাবনা প্রকাশ করেন। যেগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল নারী কল্যাণ ও নারীর সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা। স্ত্রী শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল, "স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ভিন্ন আমাদের সর্ববিধ সামাজিক উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। স্ত্রী শিক্ষা এবং জন শিক্ষার অভাবই আমাদের সমাজের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। আমি ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারি, বঙ্গদেশের সামাজিক উন্নতি ইহার নারীগণের সাহায্যেই হইবে।"

তিনি অগ্রণি মানসিকতার পরিচয় দিয়ে পতিতা মেয়েদের পাপের পথ থেকে উদ্ধার করে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার মতো মহৎ কাজ করেছিলেন। অসহায় নির্যাতিত মেয়েরা তাঁর পরিবারে আপনজনের মতো আশ্রয় লাভ করতো।

১৮৮৮ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী নারী শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে মেয়েদের জন্য নীতি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নারী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দ মোহন বসুর সাথে একযোগে ১৮৭৯ সালে তিনি সিটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৮৩ সালে তিনি কিশোরদের জন্য ভারতের প্রথম মাসিক পত্রিকা 'সখা' প্রকাশ করেন।

ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে এক নতুন স্রোতধারা যার দ্বারা মেয়েরা নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। শিক্ষার বিকাশ আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ বৃদ্ধি করে। গৃহবন্দী দাসী থেকে দশভূজা দেবীরূপে নারীর জীবন প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভূমিকা নিঃসন্দেহে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়।

এপিজে কালাম ঃ এক স্বপ্ন উড়ান

নন্দন সাহা ● সহকারী অধ্যাপক

আধুনিক ভারতবর্ষে যে ব্যক্তিটি রাজনৈতিক মঞ্চে উঠেও সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি হলেন ভারতবর্ষের একাদশ রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আবদুল কালাম। তিনি ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিক্ষক এবং রাষ্ট্র হিতৈষী ব্যক্তিত্ব। বিগত শতকের ত্রিশের দশকে তৎকালীন মাদ্রাজ প্রদেশের রামেশ্বরমের এক দরিদ্র পিতামাতার পঞ্চম তথা কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন ড. কালাম। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী এবং এজন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। কালামের জীবনী থেকে পাওয়া যায় তিনি শৈশবে সংবাদপত্র বিক্রির মত সাধারণ কাজ করে পরিবার প্রতিপালনে অবদান রাখতেন। তবে অর্থ ও পরিস্থিতি কখনই তাঁর বিদ্যালাভের পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে ওঠেনি। তিনি স্থানীয় স্কুল থেকে প্রাথমিক পর্বের শিক্ষা সমাপ্ত করে ত্রিচির সেন্ট জোসেফ কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হন। কিন্তু এই সময়ই তাঁর পদার্থবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ কমে উড্ডয়নবিদ্যায় আগ্রহ বাড়তে থাকে। এজন্য তিনি মাদ্রাজের ইন্সটিটিউট অব অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি সফলভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমান চালক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই পরীক্ষায় তিনি ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় তিনিই একমাত্র ব্যর্থ হন কিন্তু তিনি হতাশ হননি, বরং লক্ষ্য পূরণে Defence Research and Development Organisation -এ একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তথা বিজ্ঞানী হিসাবে যোগদান করেন। এখানে তিনি প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই, সতীশ ধাওয়ান প্রমুখের অধীনে কাজ করার সুযোগ পান। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার কারণে সকলের নজরে পড়ে যান। এইসময় উন্নত বিশ্বে মহাকাশ গবেষণায় বিপ্লব চলছিল যার দেখাদেখি ভারতেও মহাকাশ গবেষণায় জোর দেওয়া এবং

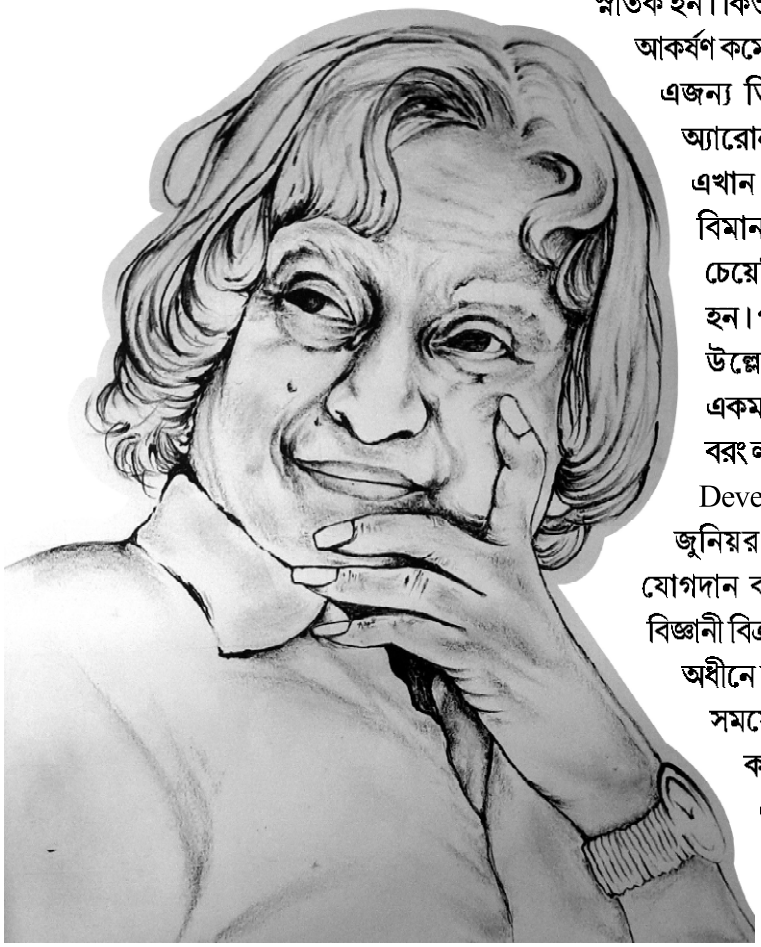

ছবি : দেবীশা নন্দী ● সেমিস্টার-১ ● ইংরেজী অনার্স

তাঁকে দেশের নিরাপত্তার কাজে লাগানোর চেষ্টা শুরু হয়। ইতিমধ্যেই নাসায় ঘুরে আসা কালাম যোগ দেন ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোতে। তিনি হয়ে যান দেশের প্রথম উচ্চাভিলাষী স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেলের প্রকল্প আধিকারিক। এই সময় তিনি পরের পর অগ্নি, পৃথ্বী সহ একাধিক প্রকল্প অত্যাশ্চর্য দক্ষতায় সম্পন্ন করে দেশকে মহাকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণায় একলপ্তে কয়েক যুগ এগিয়ে দেন। ফলশ্রুতিতে দেশ তাঁকে ভালোবেসে 'মিসাইল ম্যান' অ্যাখ্যা দিয়েছিল।

কথিত আছে তিনি তাঁর কাজে এতটাই নিমগ্ন থাকতেন যে নিজের বিবাহের দিন ভুলে গিয়েছিলেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত তাই দিল্লিতে একাধিক সরকার বদল হলেও কালাম ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞানবিষয়ক মুখ্য পরামর্শদাতা এবং DRDO সচিব। অতঃপর ভারতের দ্বিতীয় পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা প্রকল্প 'অপারেশন শক্তি' সফলভাবে সম্পন্ন করে ড. কালাম বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। সারা বিশ্ব ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সাফল্য মানতে বাধ্য হয়। এই সাফল্য ড. কালামের জীবনেরও মোড় ঘুরিয়ে দেয়, ২০০২ সালে একাদশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ জোটের তরফ থেকে ড. কালামের নাম প্রস্তাব করা হলে বিরোধী দলের তরফ থেকেও তাঁকে সমর্থনের ঘোষণা করা হয়। অবশেষে ২৫শে জুলাই ২০০২ তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অবশ্য ইতিমধ্যেই তিনি ভারতরত্ন সহ দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার জিতে নিয়েছেন।

সব শেষে একটি চমকপ্রদ তথ্য দিয়ে লেখা শেষ করি। আসলে পদাধিকার বলে ভারতের রাষ্ট্রপতি স্থল, জল এবং বিমান বাহিনীর সর্বাধিয়ানক। যৌবনে যে বাহিনীতে একজন যুদ্ধবিমান চালক হিসেবে যুক্ত হতে ড. কালাম ব্যর্থ হয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি সেই বাহিনীরই সর্বাধিনায়কে পরিণত হন। তবু রাষ্ট্রপতি থাকাকালে প্রায় ছয়মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে অবশেষে ২০০৬ সালে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান 'সুখোই-৩০' চালিয়ে যৌবনের অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করেন। আসলে কালাম একটি স্বপূরণের নাম, যাকে কেন্দ্র করে এমনিই সব গল্প ও মিথ দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে আছে।

নয়নকথা

অন্তিমা পাল ● প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

আজ কি আমায় গাইতে হবে
নীল আকাশের নির্জন গান?
নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে
ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরাণ?

প্রাণীবিদ্যা নিয়ে পড়া মানেই চারদেওয়ালের বাইরে গিয়ে প্রকৃতিকে চেনা। তাই স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে পড়তে আসতেই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা Excursion ছিল আমাদের ছাত্রছাত্রীদের একটি বিশেষ আকর্ষণের জায়গা। ২০২১ পর্যন্ত অতিমারীর চোখরাঙানি জানান দিচ্ছিলো সে ভাবনা বুঝি মরিচীকাই থেকে যাবে। কিন্তু রোগবিয়োগের পরেই আমরা দ্বিতীয়বারের জন্য পেয়ে গেলাম অদেখাকে দেখার সুবর্ণ সুযোগ, গোরুমারা ভ্রমণের পর এটিই আমাদের দ্বিতীয় Excursion ; নৈনিতাল এবং জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক ভ্রমণ।

আমরা কলেজের ১৭ জন ছাত্রী, আমাদের দেবযানী ম্যাম, NCD স্যার, নরেশকাকু এবং ট্রাভেলকাকুরা মিলে ডিসেম্বরের তৃতীয় দিনে পৌঁছলাম ছবির মতো স্নিগ্ধ সুন্দর কুয়াশাঘেরা শহর নৈনিতালে, উত্তরাখন্ডের সদর শহর নৈনিতাল, যে শহরে পান্না জলে ভাসে রাজহংসের সফেনতা, শহরেরই অন্তর্গত G.B. Pant High Altitude Zoo (পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতায় অবস্থিত চিড়িয়াখানা) তে পৌঁছলাম অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পরিচিত হলাম Kalij pheasant, বিভিন্ন ধরণের পাখি, রেড পান্ডা, ভাল্লুক এদের সাথে। ঘুমন্ত নেকড়ে এবং সরস চালে হেঁটে চলা বাঘের কীর্তি অবাক করল বেশ, আমার সবথেকে পছন্দ হল Monal পাখিটিকে, দুটো দিন ধরে ঘুরলাম আশেপাশের ম্যাল, বাজার, ম্যাঙ্গোলেক, টাইগার প্যান্থার কেভ, কৈলাসের ছায়াতলে। স্যার-ম্যামের দারুণ দারুণ অভিজ্ঞতা শোনার মাঝে গরম ভুট্টা সেদ্ধর টকঝাল আর হট চকোলেট কফির সুস্বাদ মনে করিয়ে দিল ফেলুমিত্তির তোপসের দার্জিলিং জমজমাটের চিত্রনাট্য।

নৈনিপর্ব শেষ করে আমরা জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, যাওয়ার পথেই জলছবির মতো উপত্যকা, নদীতট, ঝিলমিল ঝরণা এবং করবেট সাহেবের সংগ্রহশালা সেরে নিলাম সকলে।

বনদেবীর বনরাজ্যে পৌঁছে সেইদিনই ক্যামেরা, দূরবীণ, খাতা পেন নিয়ে সদলবলে পৌঁছলাম রিসর্টের সামনের নদীতটে, বন্যপরিবেশে ধরা দিল ময়ূর, সোনালী শেয়াল, আরও নানা পাখি। পরদিন ভোর হতে না হতেই হিম পরশ গায়ে মেখে বনের শপথ বুকে নিয়ে হুডখোলা জিপসিতে চড়ে ঘুরে নিলাম বিজরাণীর জঙ্গল, অনেক প্রাণীর দেখা পেলেও উনি বা তিনি শুধুমাত্র পায়ের ছাপ দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকলেন। হলুদ- কালোর ডোরাকাটা, বুশ বিটিংয়ের নতুন চমক, কীটপতঙ্গ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে সেদিনের সফর শেষ করলাম আমরা।

ঝিরণা জোনের ঢেলা বনাঞ্চলের দেখা পেলাম স্লথ ভালুকের, দূরবিনের তৎপরতায় প্রতিদিন প্রাণবন্ত হতে থাকল "বন্যেরা বনে সুন্দর" প্রবাদের সারমর্ম, এরই মাঝে জমতে লাগল আমাদের গল্প, আড্ডা, খাওয়া দাওয়া, ম্যাম–স্যারের কাছে শুনে শুনে নিচ্ছিলাম পাখি চেনার ধরণ, শিখলাম জঙ্গলের নানা সংকেত সহ অনেক কিছু।

ধিকালার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এর মধ্যে রোমহর্ষক আমার কাছে। করবেট অঞ্চলে এটিই সবচেয়ে সুন্দর অরণ্য, আমরা সকলে ক্যান্টরে চেপে ঘুরলাম ধিকালার শালঘেরা অরণ্য রামগঙ্গার দৃশ্য মন ভরিয়ে দিল, দেখা হল অনেক বনবাসী জীবদের সাথে। কিন্তু সাড়ে তিন ঘন্টা কেটে গেলেও ধিকালার আসল আকর্ষণ রয়্যালবেঙ্গল টাইগার বা চিতাবাঘ কারোরই দেখা পেলাম না, বেশ মুষড়ে পড়লাম সকলেই, করবেটে এসে বাঘ দেখলাম না বাড়ী ফিরে সকলকে বলতে হবে ভেবেই লজ্জা লাগছিল মনে মনে, যদিও বাঘ দেখাটাই সব ছিল না আমাদের কাছে, ম্যাম বারবার বলেছিলেন "জঙ্গলকে দেখছো সামনে থেকে এটাই সবচেয়ে বড়ো অহংকার", তবুও মনটা যেন ভরছিল না কিছুতেই। গাইডসাহেবও হাল ছেড়েই দিয়েছিলেন প্রায়, কিন্তু কথায় আছে না "সবুরে মেওয়া ফলে", হ্যাঁ সত্যিই তাই ভাগ্যের শিকে ছিঁড়লো আমাদের, অবশেষে সামনে এলেন বাঘমামা, রাজকীয় ভঙ্গিতে হেঁটে গেলেন চোখের সামনে দিয়েই। উত্তেজনা, ভয়, আনন্দ, সার্থকতা সব মিলে সে যে কি দারুণ শিহরণ আমাদের, খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম প্রত্যেকে, ম্যাম আনন্দে কেঁদে ফেললেন পর্যন্ত, ভয়ঙ্কর সুন্দরকে সামনে থেকে দেখার আনন্দকে উদ্‌যাপন করলাম ম্যামের খাওয়ানো বিখ্যাত মিষ্টি এবং রসমালাইয়ের স্বাদগ্রহণের মাধ্যমে

ফেরার আগে রাতে রিসর্টের লনে বসলো চাঁদের হাটে, একহাতে সব সাজালেন ম্যাম স্যার, কেক কাটা, বনফায়ার, গানে নাচে মেতে উঠলাম সকলে, চললো প্রচুর আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, স্মৃতিচারণের প্রতিলিপি লিখনের মাধ্যমে নিজেদের মেলে ধরলাম আমরা, স্যার ম্যাম ধরিয়ে দিলেন ঠিক বেঠিকের রাস্তা, সব মুহূর্তগুলো বন্দী করে নিলাম মনের চিলেকোঠায়।

"সবুজ মাঝে, ভোরের সাজে আনন্দগান লেখা,
আগলে নিয়ে স্মৃতিরা সব বন্ধু করে রাখা"।

ভালোমন্দ মেশানো স্মৃতিদের নিয়ে কেটেই গেল দশটা দিন, বাড়ী ফিরবার মুহূর্তে নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখতে বসে চোখের কোণে চিকচিক করে উঠছে অজান্তেই, কলেজ জীবনের শেষ Excursion কে মনে রেখে দেব আমরা, মনে থাকবে ম্যামের আগলে রাখা, কঠিনের মাঝেই সহজ করে নেওয়ার আনন্দ পাথেয় হয়ে থাকবে আমাদের। বন্ধুদের হইচই, মায়াবী শহর, অচিন পাখির চাহনি, নৈনিলেকের ধারে দেদার বিকানো রংবেরঙের মোমবাতী, এলাকাবাসীদের সারল্য, একসাথে জমিয়ে ঘোরা, আনন্দ করা সব কিছু মনে থেকে যাবে আমাদের।

এবার ঘরে ফেরার পালা, আবার পড়াশুনা, কলেজ, দৈনন্দিন কাঠপাথরের যান্ত্রিক জীবনযাত্রার নতুন সুরের মাঝেই যেন মনের কোণে উঁকি দেবে সবুজের মাঝে বয়ে চলা তীরে তীরে নদী, নুড়িবালি আর নিরীহ জীবকূলের আনাগোনা।

দিয়েগো অ্যালভারেজের কাছে শঙ্করের যেমন তারা চেনার পদ্ধতি জানা বাকি থেকে গেছিলো, আমাদেরও তেমন অনেক অদেখাকে দেখা, অচেনাকে চেনা বাকি রইলো, তাই "আবার আসবো ঠিক" প্রত্যয়ের অবসরেই যেন দেখতে পাব ঘনসবুজের রাশ ধরে হেঁটে চলা হলুদ কালোর পদক্ষেপ, জঙ্গল বলবে "ভালো রেখো আমাদের", "ঘুরে যেও আবার" এই অঙ্গীকারই থেকে যাক বরাবর, অনেকখানি প্রাণবায়ু বুকে নিয়ে এভাবেই শুরু হোক আমাদের আগামীর পথচলা।

আমার নৈনিতাল ও করবেট ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

এসা গায়েন ● প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

বর্তমান যুগের ব্যস্ততা ও রোজকার একই পরিবেশের ক্লান্তি এবং একঘেয়েমিতে ভরে ওঠা সেই চেনা চারপাশ থেকে আমাদের মন একটুখানি মুক্তির আনন্দের জন্য ছটফট করে। সেই একঘেয়েমি জীবন থেকে বেরোনোর একটি উপায় আমার আসে কলেজ এর ভ্রমণের মাধ্যমে। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ নিয়ে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ি আমি। দিনটি ছিল 2nd ডিসেম্বর, 2022 সেইদিন আমরা হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে যাত্রা শুরু করি। ট্রেনটি ছিল লালকুয়াঁ এক্সপ্রেস। গন্তব্য ছিল সুদূর পাহাড়ে ঘেরা নৈনিতাল। সেখানে আমরা পৌঁছাই ঠিক তার পরদিন সকালে। স্টেশন থেকে আমরা আমাদের থাকার জায়গায় পৌঁছাই গাড়িতে করে। চারিদিকটা ছিল ভীষণ সুন্দর যা দেখে মিলল চোখের আরাম ও মনের শান্তি। আমাদের নৈনিতাল ভ্রমণ শেষ হল 4th ডিসেম্বর। দুদিন নৈনিতালে থাকার পর আমরা চলে আসি করবেট জাতীয় উদ্যানে। এখানে আসার পূর্বে আমরা নৈনিতালে দেবীর মন্দির, নৈনিতাল চিড়িয়াখানা, নৈনিতাল হ্রদ এসব দেখার অভিজ্ঞতা হয়। যা ছিল এক অপূর্ব সুন্দর অভিজ্ঞতা। এবার আসি করবেট -এ আমার অভিজ্ঞতার কথায়। এক অপূর্ব জঙ্গল দর্শনের সুযোগ আসে এখানে আসার পরদিনই। সেখানের গাছগুলোর মধ্যে ছিল এক অদ্ভুত আকর্ষণ। করবেট পৌঁছানোর পর আমরা উঠি করবেটের কোর অঞ্চলের কাছেই এক রিসর্ট -এ। সেখান থেকেই মাঝে মধ্যেই শোনা যায় কিছু কিছু পশুর ডাক। বিভিন্ন পাখিরা এসে ভিড় করে আমাদের রিসর্ট -এর পাশের ও মধ্যের গাছগুলিতে। এগিয়ে আসছে ফেরার দিন আর মাত্র দুদিন পর এখানকার জঙ্গলকে আমার বিদায় জানিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেব। তবে মনে থেকে যাবে বিজরাণি ও ঝিরণা -র মতো জঙ্গলের অপরূপ সৌন্দর্য। তার মাঝে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীদের সমারোহ। আমরা সাফারীতে দেখেছিলাম প্রচুর হরিণ, সাথে ময়ূর, অসংখ্য পাখি ও অন্যান্য অনেক প্রাণী। যেটা না বললেই না আমাদের ম্যাম ও স্যার এর কথা যারা আমাদেরকে এই কদিন আগলে রেখেছে। ওনাদের ছাড়া ভ্রমণটা সত্যিই অসম্পূর্ণ থেকে যেত। শেষবেলায় মনটা ভারী হলেও এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ মনে থেকে যাবে চিরজীবন। এবার আসি আমাদের এই এক্সকারশনের মূল আকর্ষণে, সেটি হল ভোরবেলায় জঙ্গল সাফারী। তিনদিন আমরা সাফারীতে বেরিয়ে ছিলাম তিনটি জোনে। শেষের দিন ধিকালা তে আমরা বাঘ দেখি। সেটি ছিল এক রোমহর্ষক ঘটনা। শেষদিন রাতে আরও একটি বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের ম্যাম ও স্যারের উদ্যোগে; সেখানে আমরা সবাই মিলে ভীষণভাবে আনন্দ করি। দেখতে দেখতে ফেরার দিন চলে আসে সেটি হল 9 ই ডিসেম্বর। ভোরবেলা গাড়ি করে আমরা রওনা দিই মোরাদাবাদ স্টেশন এর দিকে। হিমগিরি ট্রেনে চড়ে আমরা ফিরে চলেছি বাড়ির উদ্দেশ্যে।

Excursion এর অভিজ্ঞতা

জুলেখা আনজুম ● প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

আমাদের Excursion এর তোড়জোড় শুরু হয় অনেকদিন আগে থেকেই। আলোচনার মাধ্যমে স্থান ঠিক হয় "জিম করবেট ন্যাশানাল পার্ক"। এই Educational excursion শুধুমাত্র জীববিদ্যা শিক্ষা নয়, এটি একটি জীবনশিক্ষা। এটি যেমন আমাদের হাতে কলমে শেখায় পড়াশোনার বিষয়, তেমনই শেখায় আরও অনেক কিছুই। আমরা শিখেছি কিভাবে সব পরিস্থিতিতে একে অপরের পাশে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এক কথায় অনেক quality time spent করেছি প্রিয় বন্ধু এবং স্যার ম্যামদের সঙ্গে।

আমাদের যাত্রা শুরু হয় হাওড়া স্টেশন থেকে 2রা ডিসেম্বর সকাল 8.15 তে Lalkuan Express -এ করে। এই দ্বিতীয়বার আমার ট্রেনে রাত কাটানো, এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা। বন্ধুদের সাথে, স্যার ম্যামদের সাথে সময় কাটানো শুরু। বাবা-মাকে ছেড়ে এই প্রথম অন্য রাজ্যে ভ্রমণ। যেমন টেনশন, তেমনই আনন্দ। শেষমেষ অনেক ধকলের পর পৌঁছালাম Lalkuan স্টেশনে পরের দিন সকাল 8 টা নাগাদ। সেখান থেকে পাড়ি দিলাম 'নৈনিতাল' — এক স্বপ্নের শহর। সেখানে আমাদের হোটেল ছিল এক দারুণ জায়গায়। সামনেই সেই 'নৈনিতাল লেক' এবং দাঁড়িয়ে আছে বিশাল পাহাড়। এ যেন এক স্বপ্নের মত। এই সবকিছুই দেখার সুযোগ হয়েছে আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় শ্রীমতি দেবযানী ম্যামের জন্য।

পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় যেমন সুন্দর ঠিক ততটাই কষ্টদায়ক উপরে ওঠা, বিশেষত National Zoo। কিন্তু শতকষ্টের পরেও সেখানে দেখা নানা ধরণের পশু এবং পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য মন কেড়ে নেয়। সুন্দরের পাল্লা এতটাই ভারী, কষ্ট তখন আর কে মনে রাখে!

দুদিনের জন্য নৈনিতালের যাত্রা সম্পন্ন করে আমরা পৌঁছাই 'জিম করবেট ন্যাশানাল পার্ক' -এ। এর মধ্যে বিখ্যাত Jim Corbett falls এবং museum দর্শন করি আমরা।

পরের দিন ভোর থেকে শুরু হয় জঙ্গল সাফারি। মোট তিনটি সাফারি করি আমরা। এর মধ্যে প্রথম দুটি সাফারি, বিজরাণি এবং ঝিরণা যথাক্রমে, সবার প্রধান আকর্ষণ 'বাঘ' সেটি দেখার সুযোগ হয়নি আমাদের। কিছুটা হতাশা, কিন্তু তার মধ্যেও অনেক ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই প্রথম Call শোনা আমার। মন কিছুটা খারাপ থাকলেও যখনই ভাবি কত কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে, মন উৎফুল্য হয়ে ওঠে। কত রকমের পাখি চিনেছি, ঘন জঙ্গলে সূর্যোদয়ের আগে ভ্রমণ এবং প্রকৃতির সাথে সময় কাটানোর আনন্দ ইত্যাদি এই এক পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা সত্যিই সম্ভব নয়।

তৃতীয় এবং শেষদিন সাফারি। আবারও বেড়িয়ে পড়ি সেই একই আশায়, 'আমরা যা দেখতে চাই, তাই যেন দেখতে পাই' -এর। হ্যাঁ, অবশেষে তার দেখা মেলে ধিকালা Zone-এ। ধরে রাখা যায়নি চোখের জল, ফেটে বেরিয়ে আসে সবার emotion। সম্পূর্ণ এবং যেন সার্থকতা পায় আমাদের excursion

তারপর আসে ফিরে আসার পালা। দিনগুলোকে আরও স্মরণীয় করার জন্য আয়োজন করা হয় ক্যাম্প ফায়ারের। সেও এক দারুণ অনুভূতি।

যাঁদের কথা না বললেই নয়, আমাদের ম্যাম এবং স্যার, যেমন বকা দিয়েছেন, ঠিক পর মুহূর্তেই তেমন

কাছেও টেনে নিয়েছেন। মায়ের মত স্নেহ করেছেন, আগলে রেখেছিলেন এই কটি দিন। আমাদেরকে এইভাবে সবকিছু শেখানো, চেনানো, স্যারের কিছু মজার মজার কথা সত্যিই ভোলা সম্ভব না। কিভাবে আমরা সবকিছু ভালোভাবে শিখে সবার থেকে এগিয়ে থাকতে পারি সেই আপ্রাণ চেষ্টাই তাঁরা করে চলেছেন।

এবার বাড়ি ফেরার পালা! এখন আমরা ট্রেনে। হয়ত এটাই শেষবারের মত প্রিয় বন্ধু ও ম্যামের সঙ্গে একটা সময় কাটানো।

চাই বারংবার ফিরে আসতে, এইভাবেই। ফিরছি সবাই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। কিন্তু সঙ্গে করে যে অসংখ্য সুন্দর মুহূর্তের স্মৃতি নিয়ে পিরছি, সেটা অমূল্য। আজীবন মনে থেকে যাবে সবকিছুই।

ফ্রেমে এইটুকুই বলতে চাই —

"আবার আসিব ফিরে"

এক ছুট্টে লুলং

প্রকৃতি দাস
সহকারী অধ্যাপক ● ভূগোল বিভাগ

"কে জানে আজ কেন মন
দূর আকাশ ছুঁতে চায়
তবু দুপায়ে কিসের বাধা
যেন থমকে দাঁড়ায়
জানিনা.....কী কারণ"
-নচিকেতা চট্টোপাধ্যায়

জানছিলাম, সঠিকভাবে বললে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। সত্যিই কি কারণ? আসলে কারণ হল অসম্ভব কর্মব্যস্ত জীবন, বিপুল কাজের চাপ এবং চলভাষের মুহুর্মুহু হাঁকডাক।

এসব থেকে বাঁচতেই ঠিক করলাম বেরিয়ে পড়ব, কোথাও ছুটে যাব, কোন নির্জনের কোলে। অতঃপর পরিবারের সাথে আলোচনায় উঠে এল লুলুংয়ের নাম। ছোট্ট এই নির্জন জায়গাটি বাড়ির সকলেরই কমবেশি পছন্দ হল।

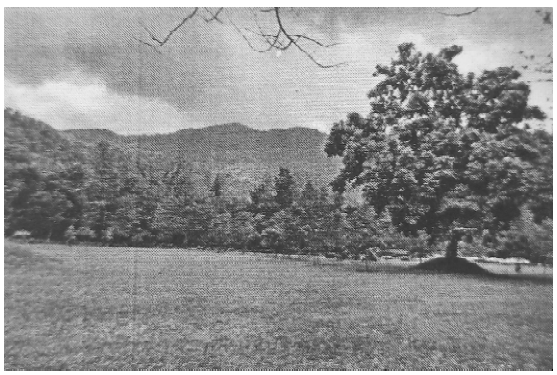

একটু আলাদা, একটু স্বতন্ত্র, অনেকটা নির্জন এবং সম্পূর্ণরূপে আধুনিক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার বাইরে অবস্থিত এই লুলুং। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার অন্তর্গত সিমলিপাল জাতীয় উদ্যানের পূর্ব প্রান্তের প্রবেশদ্বার হল লুলুং। এই সিমলিপাল হল একটি সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্প ক্ষেত্র। ভৌগোলিকভাবে লুলুং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মিটার উচ্চতায় ২১.৯৮১৬ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৬.৫৫৪০ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত ২৭৫০ কিলোমিটার ব্যাপ্ত অঞ্চল। এই অঞ্চলের বুক চিরে তিরতির করে বইছে চিরস্রোতা পলপলা নদী, নদীর দুই তীরে গড়ে ওঠা ঘন অরণ্য শোভা আরও বাড়িয়ে তোলে।

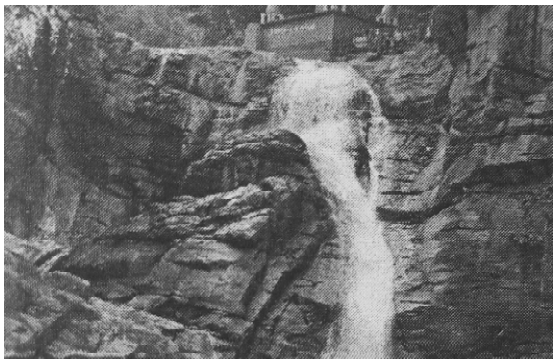

লুলুংয়ের গহীন এই অরণ্যে আছে হাতি, হরিণ, লেপার্ড ও বাঘ। এছাড়াও মোটামুটি ৫৫ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩০৪ রকমের পাখি, ৬০ রকমের সরীসৃপ, ২১ রকমের ব্যাঙ, ৩৮ রকমের মাছ এবং ১৬৪ রকমের প্রজাপতির খোঁজ এই অরণ্যে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন রকম পাখি এবং অর্কিডের সুবাদে প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে লুলুংয়ের আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। নির্জন হলেও লুলুং কিন্তু একদম জনশূন্য নয়। বেশ কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী এখানে বসবাস করে। এদের মধ্যে সাঁওতাল, মহালী, কোলহা, বাথুরি, মাঙ্কিড়িয়া, বিরহর্ষ, ভুঁইয়া ও খাঁড়িয়া প্রভৃতি জনজাতির আধিক্য দেখা যায়। সম্প্রতি অঞ্চলটি ইউনেস্কোর World Network of Biosphere Reserve-র তালিকাভুক্ত হয়েছে। এখানকার জলবায়ু বেশ মনোরম, গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪২ ডিগ্রি হলেও বছরের অধিকাংশ সময় তাপমাত্রা সহনীয় থাকে। তবে

শীতকালে সর্বনিম্ন ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যায়। পর্যটকদের জন্য আবহাওয়ার পাশাপাশি এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশও মনোমুগ্ধকর। জঙ্গলের মধ্যে বিরল কিছু প্রাণী, যথা পায়েড হর্নবিল, মালাবার হর্নবিল, চারশিং যুক্ত সম্বর হরিণ, ট্রাইকিউনরেট, পাহাড়ি কচ্ছপ দেখতে পাওয়া যায়। আবার এই লুলুংয়েই দুই জলপ্রপাত জোরান্দা (১৫০ কিমি) বারেহিপানি (৪০০ কিমি) প্রকৃতিপ্রেমী মানুষকে মুগ্ধ করবেই।

ঊড়িষ্যা সরকার ১৯৭৯ সালে সিমলিপালকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে। যদিও বাঘের আশ্রয়স্থল হওয়ায় ১৯৭৩ থেকেই অঞ্চলটি ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে সংরক্ষিত অঞ্চলের পরিধি আরও বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৯৮৬ সালে প্রায় ৮৪৬ বর্গ কিমি এলাকাকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল ১৯৮২ এবং ১৯৯০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়কে সিমলিপাল প্রতিরোধ করে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

লুলুংয়ের উদ্দেশ্যে আমরা রওনা দিয়েছিলাম গতবছর মে মাসের ১১ তারিখে। ভোরের মিঠা বাতাস গায়ে মেখে রূপনারায়ণের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে খড়গপুর রেল শহর ছুঁয়ে প্রথমে ঊড়িষ্যা প্রবেশ করলাম। একটু পরেই এল বারিপদা, সেখান থেকে এগিয়ে চললাম লুলুংয়ের দিকে। সবমিলিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা যাত্রা সাঙ্গ করে গন্তব্যে পৌঁছলাম। এখানে প্রবেশ করে বাইরের জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমাদের থাকার জন্য বুকিং করা হয়েছিল লুলুং অরণ্য নিবাস। পিঠবাটা বিটের প্রবেশদ্বার হয়ে খানিক ভিতরে এই রিসর্ট। রিসর্টের স্থানীয় কর্মচারীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্যে এক লহমায় যেন সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। রিসর্টের পাশেই তিরতির বইছে পলপলা নদী, একটু দূরে টিলার আকারে পাহাড় আর নাম না জানা পাখির ডাক... লুলুং যেন আধুনিক পৃথিবীতে একখন্ড ব্যতিক্রমী স্থান।

আমাদের রিসর্টটি ছিল একরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনবেলার খাবার সহ অবসর ও বিনোদনের নানারকম সুবিধা সেখানে উপলব্ধ ছিল। এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই বাচ্চাদের খেলার জায়গা, সরঞ্জাম, ব্যায়ামের ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার সমস্ত ব্যবস্থাপনা আছে। মধ্যাহ্নভোজন সেরে পলপলা নদীর পাশ ধরে শুরু হল জঙ্গলবিহার। গ্রীষ্মকাল বলে নদীতে জল ছিল কম, নদীর ধারে অসংখ্য গাছপালা, পাখির ডাক শুনতে শুনতে সন্ধ্যা নেমে এল। যেহেতু বিকেল ৫টার পর জঙ্গলে থাকা নিষেধ তাই অগত্যা আমরা রিসর্টে ফিরে এলাম। সন্ধ্যায় রিসর্টে অপেক্ষা করছিল অন্য অভিজ্ঞতা। নিজস্ব ধারার গানের সাথে আদিবাসীদের নাচ। এখানকার স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ২৫-৩০ জনের একটি দল ধামসা, মাদল, ঢোল, ঝুনঝুনি সহযোগে সমগ্র সন্ধ্যেটা আমাদের মাতিয়ে রেখেছিল। একসময় নাচিয়েদের আহ্বানে আমিও পা মেলালাম। নাচে গানে সন্ধ্যেটা দারুণ কাটল।

পরদিন আমাদের কর্মসূচী ছিল জঙ্গল ট্রেকিং। একদম ভোরবেলা সকলে মিলে প্রায় দুই তিন কিলোমিটার পথ পায়ে পায়ে হেঁটে এলাম। রাস্তাটি ছিল চিত্রগ্রাহকদের জন্য আদর্শস্থান। সীতাকুন্ডে পৌঁছে তার সৌন্দর্যে আমরা মোহিত হয়ে চেয়ে রইলাম।

পাহাড়ের গা বেয়ে প্রবল গতিতে আছড়ে পড়ছে জল আর তার পাশে পাথর, নুড়ি এবং শ্যাওলা-ছাওয়া গাছ-আগাছার সমাহার। শুধু একটা বিষয়ই খারাপ লাগল, তা হল জঙ্গলের পথ ও জলপ্রপাতের কাছে মানুষের ফেলে যাওয়া প্লাস্টিক ও আবর্জনা। প্রকৃতির নির্মলতার মাঝে এত আবর্জনা সত্যিই বেমানান। সীতাকুন্ডের পাশাপাশি গিয়েছিলাম দেবকুন্ড দেখতে। লুলুং থেকে খানিকটা দূরে দেবকুন্ড ভীষণ সুন্দর একটি জলপ্রপাত। গ্রীষ্মকাল হলেও এখানে জলের পরিমাণ বেশি এবং জল অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ। দেবকুন্ড থেকে এবড়ো-খেবড়ো পথে হেঁটে গাড়িতে ফিরলাম সেখান থেকে সটান রিসর্টে। ফিরে এসে রিসর্টের সুইমিং পুলে পরিবারের সকলকে নিয়ে প্রচুর মজা করলাম। বাচ্চা থেকে বড় সকলেই এই আনন্দে মেতে উঠল। স্নান সেরে উঠতে না উঠতেই দুপুরের খাবার এসে হাজির। সেদিন ঘরোয়া পরিবেশে বাঙালি পদ ভোজনের আয়েশ বহুদিন মনে থাকবে।

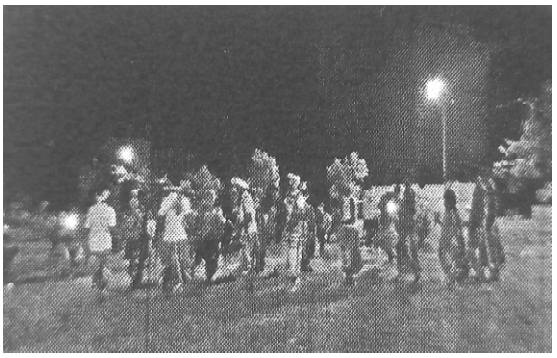

মধ্যাহ্নভোজন সেরে শুরু হল ফিরে আসার যাত্রা। ছোট এই ঝটিকা সফরেও মনে দাগ কাটল স্থানীয় আদিবাসীদের আতিথেয়তা এবং সরল-সাদা জীবনযাপন। আজকের সময়ে আমরা যখন ইন্টারনেট এবং অত্যাধুনিক সেলফোন ছাড়া একটি মুহূর্তও কাটাতে পারিনা সেখানে এরা প্রকৃতির মাঝে দিব্যি হেসেখেলে বেঁচে আছে। স্বল্প এই ভ্রমণে আমরা লুলুংয়ের পুরোটা হয়ত দেখে উঠতে পারলাম না কিন্তু যেটুকু দেখলাম তাতে মনে তৃপ্তির রেশ রয়ে যাবে। সুযোগ পেলে আবার ছুটে যাবো লুলুং।

"A thing of beauty is a joy for ever

Sananda Laha ● English Dept.

"A thing of beauty is a joy for ever
Its loveliness increases; it will never
Pass into nothingness."

-*Endymion*

It is this very sentiment that had driven young Keats from the beginning to new expeditions to garner knowledge, greater intensity of experience and acuteness of vision. Even the sad brevity of his life could not impede him from seeking those truths and conveying them with a rare power and felicity. In fact, the plangent paradox of life has not as often been expressed with such vitality and honesty as in Keats' poetry. Experiencing the existential agony in the process of intense living, he peered into the inmost truth of life which his imagination recognized as beauty. Like the ancient Greeks, Keats exhibited a heroic acceptance of life for all its inscrutability and afflictions. Like them he listened compulsively to the twin strains of ecstasy and agony. It was because he saw and embraced the abounding beauty of life with such zest, the he also experienced the pain of it is so intensely. And so he wrote, this pain can be "seen of none save him whose strenuous tongue / Can burst joy's grape against his palate fine".

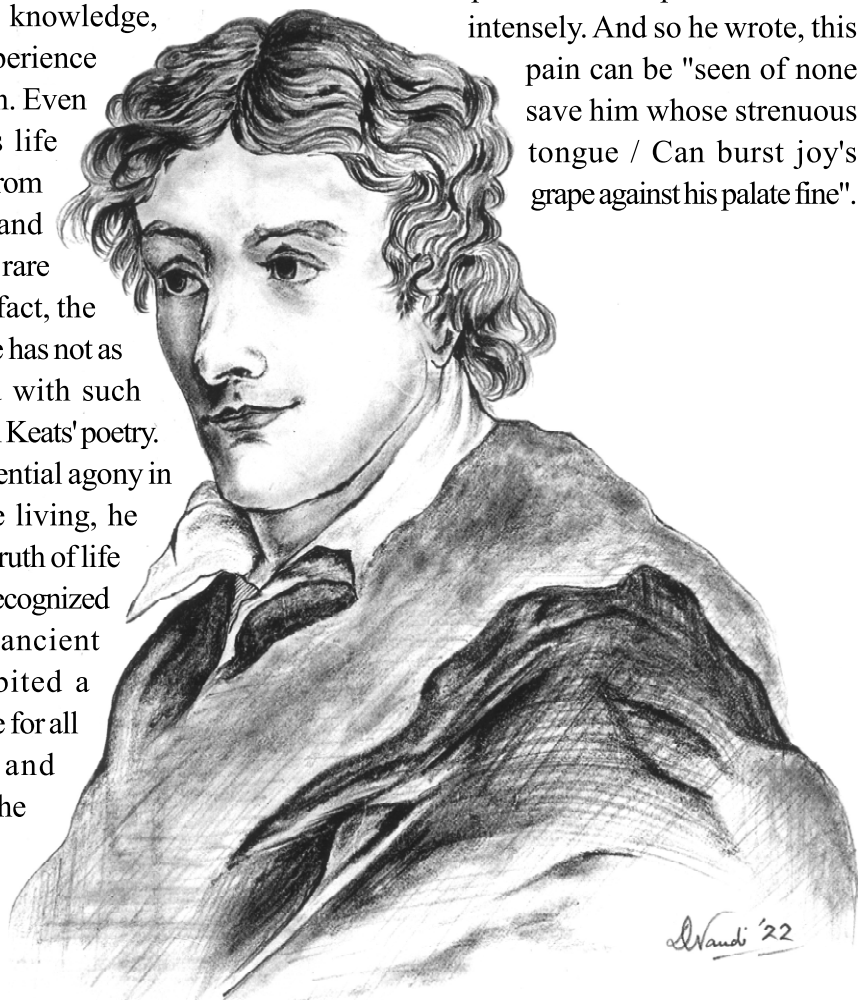

ছবি : দেবীশা নন্দী ● সেমিস্টার-১ ● ইংরেজী অনার্স

A Memorable Excursion

Suchismita Das

Zoology Dept. ● Semister V

Being a student, there are ample experiences we die for college excursion is one of them. It is common knowledge that education is not complete until one's mind is widened be seeing more things, with a hungry heart of the world. So when our department decided an educational excursion to Nainitaal Jim Corbett National Park, it was an opportunity too good to be lost. Packing up was a simple affair; each of us got a hold-all into which we pushed all our necessaries, to make it a light luggage for an one week trip. I was ecstatic, as a I boarded the Lalkuan Express at 8.15 am from Howrah station. After a tensive 25 hrs of train journey we reached our destination, the Lalkuan station and then after 3.5 hours of car journey we reached Nainital via Bhimtaal. To me, Nainital is something marvelous, seeing it for the first time, I just stand and atare and wonder. In the evening, we first went to the Nainitaal Lake and the mall road and spent the time admiring it's serenity. The next day we went to Nainitaal Zoo for our field work. It was a diverse experience working at the world's highest altitude zoo. We saw Sambar Deer, Spotted Deer, Royal Bengal Tiger, White Peacock, Leopard, Egale etc. As my field work subject was Spotted Deer, I spent a lot of time observing their behaviour and the experience was wonderful. The next day we managed to see various view points like the Lover's Point. As I saw the snow covered Himalayan range from the Nainitaal view point, the feeling was sensational. Next day we packed and left for Jim Corbett National Park. On the way we saw the Woodland Waterfall and Corbett Waterfalls. We also visited the Corbett Museum and knowing about this eminent man's life was really intriguing. The resort we stayed in the Jim Corbett was very near to the Dhela zone core area and to us inholders, living in the middle of the forest among numerous animals is something incredible. Next day we wake up at 4am and reached the Bijrani zone to catch the morning safari in jeep. As I entered the forest at the crack of dawn, the beauty of jungle was something else. With the help our teacher and nature guide we spotted the Great Hornbill, River Lapwing, Wagtail, Kingfisher, Black Necked Stork, Barking Deer, Peacock etc. I had a great experience in watching birds like Treepie, Red vented Bulbul, White Whiskeded Bulbul, Finch, Plum heated Parakeet. They are so diversified in forms and habits that they are a constant source of pleasure with their intricate form, color and behaviour. At evening, we went to the near riverside and spotted Jackals, Peafowl, Plum headed Parakeet and Spotted Dear. Next day we went to Jhirna Zone and the thrill was inexplicable. As the Sun rose over the horizon, it awoke the jungle slowly and efficiently. Our Nature guide was so experienced and we had a great time watching the birds like Peacock, Martins, Swallows, Vulture, Hornbill etc. At the

evening, I experienced the rare deelight of watching various birds like Peacock, Alexadrine Parakeet, Eurasian Coloured Dove, Stork billed Kingfisher and animals like Spotted Deer, Jackal etc. While enjoying the Nature's trail at near riverbank side. Next day we all woke up very early to catch the morning safari at Dhikala Zone, the biggest zone of Jim Corbett Tiger Reserve. This time we all went toghther in a Canter and explored the gently undulating, mixed deciduous forest. We spotted timid Barking deers as well as Spotted Deer, Alligator, Wild Boar, Peacock etc. After approximately 3 hours of safari to our staggering surprise we encountered an ostonishingly majestic Tiger who regarded us which meandered between the trees. Watching it in wild, is a lifetime experience to cherish for. That evening our respected teachers organised a camp fire and we all had a blast, having roasted chickens and cutting cake as it marked the end of our last excursion of our college life. We were all melancholic and nostalgic as we were having our last excursion dinner all together. Next day we came to Moradabad Junction and boarded the Himgiri Express to return home. It was an immaculate and a wholesome lifelong experience.

An Excursion

Ankita Chatterjee
Department of Zoology ● Semister 6 (H)

"Wild is the music
of autummal winds
Amongst the faded woods."

- William Wordsworth

Forests serve the best retreat for millions of people who live in the hustle of metropolitan cities, yet yearn for the serenity of nature. I am one of them, and this educational excursion was both enriching and relaxing at the same time, thanks to our professors, DD Maam and NCD Sir, who made it happen this way. Away from the classroom, the black and white textbooks, diagrams, microscopes and blackboard, I gained a lot of knowledge and valuable insight into life. There were several moments, experiences unique to this excursion, and I will mention the few which touched my heart.

The most memorable moments so far were - the car ride to Nainital from Lalkuan station, during which I got to visit Bhimtal Lake an underrated beauty; the visit to the G.B. Pant High Allitude Zoo at Naintal during which I got to observe the behaviour of various birds and animals, my favourite being that of the leopard, the morning Safaris at Bijrani and Jhirnna Zones of Corbett Tiger Reserve, during which we trailed through roads cutting through the dense greeney, marked by fresh paw prints of tiger(s), thrill coursing through our veins; the morning safari at Dhikala Zone, when we passed by streches of tall sal trees (the view was cinematic) and entered into grasslands passing by the pebble filled shores of the pellucid Ramganga river, in desperate search of Royal Bengal Tigers, and after a long search and even longer wait, finally witnessed majestic grace of a Royal Bengal Tiger leisurely walking down a trail through the grasses, only to disappear seconds later, all of a sudden; and finally, last but definitely not the least, the celebration beside the bonfire, - we sang, danced, ate delicious chicken roasted in the fire along with the ceremonial lake and celebrated the last night of our excursion.

The beauty of Nainital, the city of lakes, was enchanting to say the least, but the trainquil yet noisy ambience of the forest, early in the morning, amidst a dense layer of fog at places, cold wind brushing against my face, and the grace of the animals and birds in the wildnerness will always hold a fond place in my heart, amidst memories, accompained by the faces of people who experienced the same with me.

Efforts

Debasmita Saha
Semester-III ● English (Hons)

Life will show you many ways to be happy but still can't surpass the number of disappointments you face along with that added on expectations. Talking of a relationship between two people sounds sweeter than a gualab jamun for the ones who haven't really tasted it yet. The more you give, the more empty you become. The voidness will be prominent with each conversation, with each revelation, with each expression of emotions that goes on perpetually.

Likewise, Dimpi, a girl of twenty, recently a sophomore in Cambridge University, got into a relationship with a boy named Shehan Jaiswal. Dimpi is the one who never fails to put an effort into the bonding to make it prosper, yet feels dejected by the actions of her counterpart. She after pouring all the last bit of her, feels a loss of herself in turn. After 23 months of apparent jocund courtship, today she finally breaks down and shatters into shards when Shehan accuses her of not giving the former sufficient importance as her actions rightly demands. He blames her for being harsh with him which is the little burst of her desires to a particular thing of which she has been deprived of. But Shehan never admits the fault of his part and tries to point at Dimpi to be the miscreant.

Today, Dimpi was feeling uncontrollably alone & was in need for a company along with some tender pampering after a tired day. Dialing Shehan's number in her phone, she waits for a couple of rings until his "Helloou" comes up from the other side.

Greeting cheerfully, Dimpi grins and loads over by saying, "I miss you so much, my Jumbo!"

Shehan with equal enthusiasm and with a tone of playful mockery responded, "Oh really, but I don't."

Dimpi got instantaneously wrathful and with a burst, she exclaimed, "Get lost, you idiot. I wasn't really missing you."

She talks about her best friend and tries to irritate Shehan by comparing her best friend's boy friend. This makes Dimpi's Jumbo go on to a total mute. And she went on with all the possible accusations that she could probably think of for making Shehan feel envious.

But this is where it takes a turn, and Shehan being quiet for a while, begins with a thud.

He exclaims, "Do I not love you? Do I not keep awake at night till late hours? Do I not travel 19 kilometers all upto your place just to visit you? Do I not give you enough space that one could possily ask for? What exactly mpre that you want Dimpi?

Enough is enough and we know when not to cross the limit by overdoing it. Ending his part of the explanation, Shehan dismisses the call for he has to take a shower at that hour. Dimpi lying on the bed with her face thrusted on the pillow,

stares at the ceiling for a minute or two, and warm gush of salty water rolls down those fair rosy cheeks. She gradully hides her face into the cushion and the cotton underlying absorbs all the tears.

Just then her mother calls her from the kitchen next to the bedroom, "Dimpu, come to the table. It's time for lunch already."

"Yes, Mom", a broken hushed voice answer.

She hardly eats anything at the table and somehow supresses her overflowing emotions by stuffing a rice ball and gobbling it like a kid. This makes her mother go suspicious about the unnatural behaviour that she unwillingly does and can't help.

Sometimes, an excessive range of sorrow turns into a frightful wrath and which is exactly what Dimpi followed once she was done with her meal. She called up her Jumbo and; "What do you think you are? Huh? You will accuse me and make me feel guilty about the things that you think I have done to you and I will not say a word? All you see is my complaints and all the efforts that I put to love, you skip it all?

"No, Dimpi", a frightened respond came.

"Did you at all remember that I have a doctor's appointment today? No, Why would you? All I need is your affection and you end up doing such dishonour to my feelings? Don't you dare do this to me the next time Shehan. The day when you can love me as much I do, only then you have the authority to scold."

The call ends.

Even before he could utter a word or apologize the call follows a long beep and terminates abruptly.

Now, Dimpi has to go to see the ENT for a minor middle ear infection and check out whether the former medication has done anything better to it or rather worsen it. It is Day-2, the check-up-term. Waiting in the reception for almost thirty-five minutes and anticipating for her turn which is 14th in the patient's catalogue, she scrolls through the Instagram, contemplating about the bitterly words that she had inflicted on Shehan and instantaneously regrets it. Being restless and sorry at the same time, she goes to the log list and dials her Jumbo's number.

With a mumble, she begins, "Jumbo...I am scared."

"Why Dimpu?" a pleasant and compeletly calm voice comes up.

"Don't know what the doctor will say today...if he suggests for a surgery?"

"Nothing will happen as such my little girl. Be brave as you always are and I will pray for a better fortune that you meet as you deserve. I am there for you, don't worry."

Nothing came from this side.

The contentment and sense of peace which occurred in Dimpi's bosom, left her burdened with remorse. She could barely see.

"Thank youuu, Jumbo", she elated sap.

For the rest of that afternoon she tried to focus and concentrate on her assignment of which she had the deadline within the week. As time waits for none, soon it came to the hour in the eve when Shehan video called her.

"Hey, what's up?" beckoned Shehan.

Not a word but a mild, forced beam came up Dimpi's face. She still felt the guilt and confessed, 'Shehan, I should not have been that rude to you."

"Can you forgive me?"

"I already did baby girl."

Having sensitive and active lacrimal glands, her eyes ones again bulged up with tears.

"I'll never force you again Jumbo, I swear on my life. I know how difficult it has been for you when I constantly pressurized you to reciprocate all the affection that I thought I had shown to you."

"Will you stop crying or shall I end the call?" reprimanded Shehan.

Wiping her face off, she smiles and harps, "The very thought of forcing you disgusts me, and I never could possibly imagine that a girl like me could ever do it to you."

Pampering with the sweet of the sweetest words, Shehan coddles,

"I love you Dimpi Aggarwal."

Continuing spoiling her, he says, "You can never force me my little sweetpie. And evenif you do, I do enjoy it on the contray. You such a puddle of purity is a genuine blessing to me. You are the best thing that happened to me, my Dimpu."

Dimpi melting over all the cossets, replies.

"I hate you too!"

A Reconnection

Pradipta Mallick
Semester-III ● English (Hons)

Characters

Dhruv-the main character
Shivam-colleague of Dhruv
Abhay-Dhruv's neighbour
The vender

Dhruv was late again 3rd day in a row, he's been missing his alarms cause as many adult who pay their own rent he can't sleep at night, no matter how early he sleeps, he can't really stop his head from thinking.

He reached his office and sat on his desk, with a sight he opened his laptop and Shivam approached, he was eagerly talking about how he was assigned to the project as a leader, actually Dhruv did not listen anything other than, Shivam was leading a project and automatically his thoughts told him that he was not leading any project, and a sense of unworthiness worked inside him, he removed all his thoughts and focused on his work, his phone rings,

"Hello",

"Hello, sir we have a package for you, I am sending in front of your office."

"Oh, package for me! Ok I'll be right there in a minute."

He went to the elevator and went down completely clueless that what could possibly be inside the package and after receiving the package, he remembered that it was his so desired paint box, that he ordered a month ago, the paint box his grand father gifted him once, and he could still smell the paint from his childhood which reminded him of his grandfather, his "Daddu", looking around he quickly got out of his memory lane and he focused on work on his way back home his cab dropped him a little far from his apartment and he walked to his building it is late afternoon the sun just went down, he saw a few children playing in the park and surprisingly the cotton candy vendor was also playing with them, the vender was old, he reminded Dhruv of his "Daddu" again, he sat there in the bench watched them play for almost an hour, then as the vendor saw him sitting there all alone, he came closer to Duruv and said, "Sir, do try to have some fun, dont sit here all alone, life is short enjoy every moment of it", he laughed and left.

In shock and amazement he listened to him cause that is exactly what his grand father used to say "to enjoy the life he has to the fullest, live in a moment". Dhruv sat there in silence for a moment and slowly walked home, he put his back down and sat on the couch took the paint box out of his bag, he went to put that box into his paint room, as soon as he entered the room he saw how things were shattered here and there, frames little dusty, brushes are full of dry colors, he stood there for a few minutes looking around, suddenly he noticed a little piece of painting on the ground, he picked it up and it was the painting he had made in his childhood it was his favourite, he and his whole family standing outside his house. He drew daddu with

a smile on his face, a sense of failure shivered inside him, he took the picture and walked to the couch, sat their staring at the picture thinking of all the childhood memories and he felt lost, a stranger to his own memories.

After a while the door bell rang, Dhruv opened the door it was Abhay, with his guitar.

"Hello, how are you?"

"I'm fine, how are you?"

"Yeah great as always, so what are you doing Saturday night? I am playing at the usual place, do come with your friends."

"Oh ok I will try."

"Yeah you know I failed at my audition again, never mind I still have my guitar", Abhay said with a smile.

Dhruv realized it is the fourth time Abhay failed his audition, but every time he seemed happy cause he had his guitar.

Dhruv went inside his apartment with a slight smile on his face. He was happy seeing someone happy.

It was 3 am, Dhruv switched the light on in his paint room. Opened his new paint box, and the canvas slowly showed a picture of a park full of children playing and an old man with them, also a guy playing guitar on the bench.

Dhruv finds his days better now, he loves his work and loves his painting vacations on weekends, and he goes to listen to Abhay often, the work does stress him out but he just looks at his paintings and smiles, he slowly learns to appreciate himself for making slow progress, he celebrates even if he is not leading a project, his worth is not depending on his promotion, but it depends on the moments he captured on his canvas.

Roopkotha

Bidisha Chakraborty
Semester-III ● English (Hons)

"Love. What is love to you?", he asked.

"Love is the most lingering feeling I've ever had", I replied.

Hearing my answer his eyebrows furrowed. With an inquisitive eye he asked, "How?"

I repressed a smile ... and my thoughts took me to the first year of my college.

It was like any other day when I finally reached my tuition exhausted from my extra classes at college. I was seated in the first row with my friend when I first saw her. She was late for the class. Almost painting, she entered the room. That was the first time I saw her and I couldn't understand what happened but my eyes got fixed in hers, my heart pounded so hard that I thought it might explode ... my whole world stopped ... A sudden happiness crept inside my heart.

She fascinated me. She had scars she never wanted to reveal and I desperately wanted to protect her.

It took her one whole year to reciprocate my feelings. Excited, I took her in my arms and her fragile heart gave way to tears. The vulnerability of her eyes engulfed my heart. Her little things unnaturally made me at ease, She was a fairytale ...

"What happened after that Meera?"

"She made me a void."

"Why so?"

"Maybe love makes you void."

Arjun smiled.

His smile took to me to that aweful day which I never wanted to recall. I felt piercing pain in my heart.

'Sunday', a perfect day for an outing, so without giving it much of a thought she and I both packed our food and stationed ourselves at a nearby park. She loved painting so she thought of putting 'The Meera' on her pages of 'Life'. That is what she used to call her sketch books.

While she was painting me, her eyes were full of love, seeing that my heart fluttered and I could feel the butterflies inside my stomach. She shifted her gaze from me to my painting. It was a beautiful painting and so was she ...

"Then?", with a question in his eyes Arjun looked at me.

"Nothing", I looked at him.

"What? I did not get it." with a puzzled expression he said.

"I said we did not meet after that day."

"But why? You both loved each other."

"Yes... A lot." I replied.

"Then? Society??"

"No", I laughed.

"Then why?"

"Why did you marry me Meera?"

"Because ..."

"Meera why did you ever ... You loved her yet that was the last day you both meet. What changed you Meera?"

"Nothing changed me Arjun."

"Then why Meera?"

"Because she passed away that night in her bed."

"What?"

"Yes, she suffered from brain cancer ... Forth stage."

A gasp passed from Arjun's lips.

"The next day we had our classes so we promised we would sit together, but the day never came Arjun."

A single tear fell on my heart completely

"Good morning, Meera". said Arjun.

"Good morning"

"Doctor told you not to put pressure on you heart and to rest completely."

It has been a week since that day. I had a mild heart attack. Arjun doesn't question about her anymore.

He thinks I will forget about her.

But tell me one thing, how can I forget about my first love? How can I ever stop breathing or stop this pain which is slowly engulfing me entirely...

May be someday, someday some Meera will find her Roopkotha.

You too ?

Bidisha Chakraborty
Semester-III ● English (Hons)

... I heard a whisper, "You too?"

It was in the month of October when I was transferred to a new school. On the way to my school, there was a park where most of the place was occupied by cars and in a corner stood a well. To a little left were two benches rather hidden from anyone's view and just beside were two swings covered with layers of dust as it waiting for someone to ride on them. While crossing the park everyday, I always wondered how flowers of different colours filled the park which now was occupied by shrubs and bushes. There was something eerie about the park.

On one late afternoon while returning from school, I spotted a girl sitting in one of the swings and sobbing. Seeing her in that manner I got curious as to why she was sitting there alone but may be in response to my question she suddenly looked at me and gestured me to go close to her. I could not resist myself, my legs gave a start and instantly I found myself standing in front of her.

:Hi! Why are you sitting here alone at this late hour?"

:I have no friends and no one wants to play with me."

"Why, I'll play with you."

Friendship, that was how our friendship started. I would often find myself giggling without reasons. Everything seemed beautiful and Ruchi made me realize how it was to have a friend like her. As days passed by our friendship grew stronger.

One day it was raining heavily and I was late from my school and somehow managed myself under a little shed inside the park, but with time the sky got more dark and cloudy and the environment got little scary. Suddenly, I could feel a hand on my shoulder, when with a little scare on my face I looked back I saw Ruchi smiling at me. In one hand she was holding an umbrella over her head and on another hand she was holding a spare one which after looking at my puzzled face she handed me. When the rain come to a drizzle we both started walking together, giggling on our own jokes until we reached her house. With goodnight and thank you our path separated.

When I reached my home, my parents were rather worried seeing me almost drenched with rain. I got scolded a little. I told my mother how Ruchi had helped me from the rain and almost ran towards my room to change my clothes. Next day, I decided that after school I would meet her in the park and give her umbrella back.

It was late in the afternoon with the atmosphere being a little brisk when I paused in front of the park to wait for Ruchi to come. It was almost dusk and she did not show up so I got up and decided I would go to her house to return it back. When I reached there, it was

almost evening and for the first time I noticed a huge lock was hung at the entrance gate. Suddenly, everything about her house seemed a little strange to me. Some what puzzled, I knocked her neighbour's door. When she opened the door, I introduced myself as Ruchi's friend and told her that I came to return her umbrella. Hearing that she got startled and her face broke into tears. After a little later, when she got a little composed, I asked her he reason for her startled reaction whe she confessed to me that Ruchi had committed suicide seven years ago in that park's well and after that incident her parents moved out for the house leaving the house abandoned.

After hearing this, a cold chill ran through my whole body I had no sensation and blank. Tears fell down from my cheeks as I ran away from that place until I could run no more and collapsed on the ground, almost getting paralysed with the thought that my friend was a ghost. Shivers ran down my whole body which made me shake convulsively. I got up from the ground and was about to throw the umbrella when I heard a whisper, "You too?"

LETS GLOW

Sweta Biswas
Semester-III ● English (Hons)

Let the rain drops matter
In the glow of sunshine
Let the dawn matter
In the glow of night
Let the friendship matter
In the glow of enviousness
Let the smile matter
In the glow of tear
Let the love matter
In the glow of malice
Let the endless hope matter
In the glow of Life.

ছবি : উর্মি পাত্র ● সেমিস্টার-১ ● ইংরেজী অনার্স

HOME

Anisha Ghosh
Semester-III ● English (Hons)

I search for a home that's mine
I tooam tired of running,
Running away from what feels like a cage,
The weight of my wounds shattering me down,
But I only have shelters,
Temporary shelters,
I run again,
Away from this maddening crowd,
Searching helplessly for a home,
A home I can call mine,
Arms I can run to,
Cause I too am tired of running.

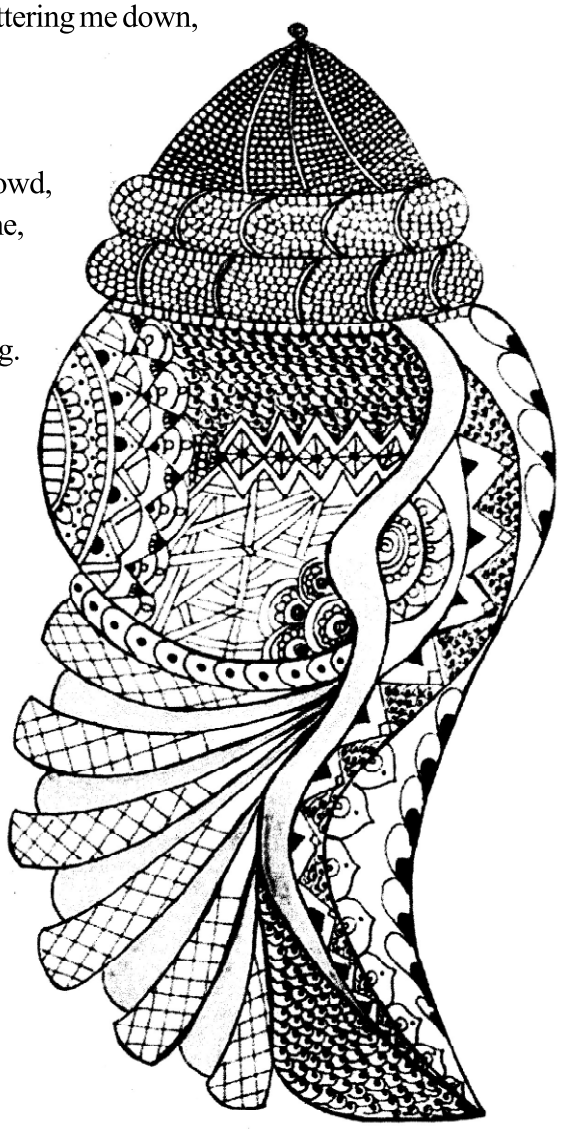

ছবি : সুচরিতা চৌধুরী ● সেমিস্টার-১ ● ইংরেজী অনার্স

AGAINST

Aryama Bhattacharya
Semester-I ● English (Hons)

As the fish push their body
Against water,
Larger birds take off
Against the wind,
To leave and live better!

As the boat floats
And displaces water,
That weighs more than own.
Then, WHY can't we displace
The perils and move on?

May be, may be we are
On the pout of the waves,
Or gliding on the grin
Or rowing on the brim,
And sometimes, not
Letting us be seen!

We must be, often, against
Of 'something',
To chase the dream and
Hit the scene!

Name : PIYANKA MONDAL ● 5th SEMISTER ● GEOGRAPHY (Hons)

AMOROUS CORPSES

Sudipta Poddar
Semester-V ● English (Hons)

A white petal pillow into the rectangle wooden box,
A black-buzzing worm
Sucking the purple essence of jasmine,
The mourning sound of joy.
White pillow faded purple, jasmine pale.
Worm loafing around the mirror
There's the carrion beautiful,
Blooming its petal.
The amorous got stuck....

Room is din
Two corpses are there.

LA MASCARADA

Aindrila Chakraborty
Semester-II ● English (Hons)

I find myself-
Imprisoned in this mazc;
Yet another test of time,
Faced with analysis paralysis,
The atmosphere doesn't rhyme.

What's it like to be human(e)?
To electroplate sinisterism,
To screen flaws with ornate laws,
That fail to preserve sanity.

What's it like to be 'Civilized'?
To celebrate fabricated exuberance,
Without questioning the morales,
Because it's forbidden territories
Of the past.

How free are we?
When we say "Free being me",
Are curtailing domains enough?
Yet your 'enough' might not pertain
To the heights I always dream of.

How entertaining is the circus?
How genuine is the laughter?
How effective is the recreation,
That comes at the price of
Imprisonment and torments?

What'd the world look like,
If it weren't a masquerade?
Where all I see around,
Are wittily masked facades
Embodying mysteries untold.

ছবি : শ্রুতি দত্ত ● সেমিস্টার-১ ● ইংরেজী অনার্স

FADE AWAY

Abhilasha Parui
Semester-I ● English (Hons)

Hey, I just dropped by to say
The magic of us really did fade away
Didn't it? Or am I overthinking,
Swimning back up yet sinking.

I've been so much better, thanks for letting me in,
But why did you have to shut yourself in?

I am in the hallway, the corridors of your mind,
You're on the other side of the door,
Cutting the ties that bind,
Bind us together as identical broken souls
We were both tending to our wounded holes.

Or tell me, be honest, did I not succeed?
Did I not succeed to be the friend in need?
Or was I burdening you, making you carry,
An extra baggage, hollow and dreary?

Sorry, I won't bother you with my incessant chatter
All that matters is that you feel better
Better with your year long friend
Better without me, us having an end,
.... I guess I sound unlike me but I can't help...

Help but wonder which was the day,
That the magic of us faded away.

ছবি : রীতি বিশ্বাস ● সেমিস্টার-৩ ● ইংরেজী অনার্স

REMEMBERING OF...

Sweta Biswas
Semester-III ● English (Hons)

Down at the beach along a pit,
I found many sand dunes and sea gulls
Which come under the environment's list
But I enjoyed these awful things with my joyful mind
Looked back to hear who is calling me? Future?
But I was just waving at my imagination
Last night I heard the sound of dancing flowers
Like that they were calling me in the glittery moonlight
But the cherry blossom shook off it's dew and I
Went to a little distance form it
I will draw white moonlight night
A sum with the dark patches in it
A flower in black or brown cloour
Could it really be
But I will draw it soon.

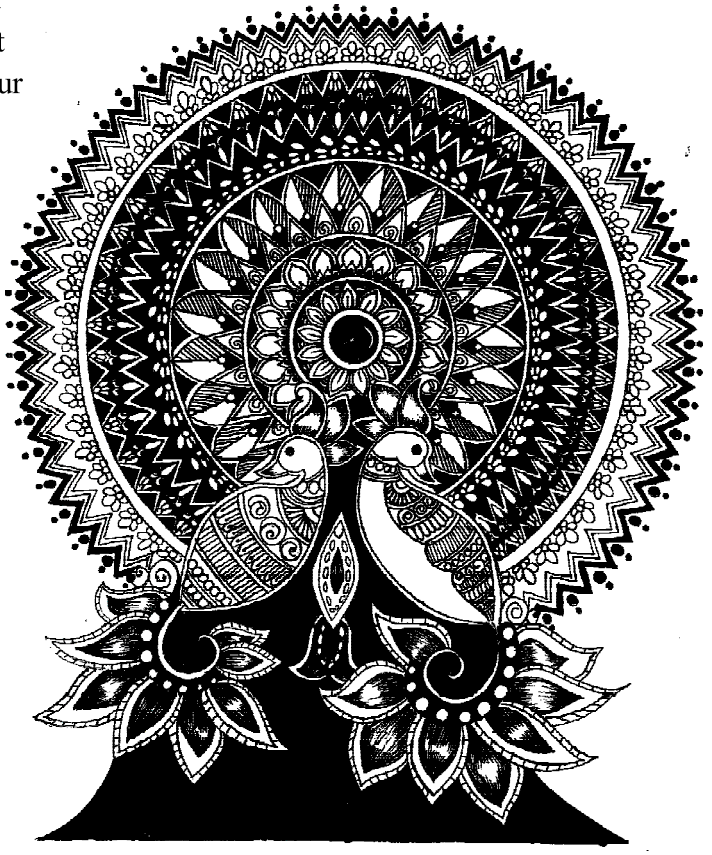

ছবি : মেঘা মন্ডল ● সেমিস্টার-৩ ● ইংরেজী অনার্স

LENSES SMOGGY

Aryama Bhattacharya
Semester-I ● English (Hons)

Gluing to the chair,
With piles on the Table,
Textbooks like plateaus
And brain not joining cables,
Is what making things blair...
Feet are way far for us,
We can't even stand on toes!

Lenses smoggy of the parents,
Dear parents, don't lose the gems.
Reading-writing with loathe latent,
Only children bear all the blame!
Sparkle their eyes, not with scores,
Awake them from their core.

Knowledge is soil,
When children are the spade,
Learning is not about only good grades,
The faith you have,
Makes them lard,
Make them daily, truly work hard.

Let them think,
Explore new things,
Let them fail and stand again
Free their minds, break the chains
They will soon find, their own domain,
Once they find, they only gain,
All you do is, just BELIVE IN THEM!

LESS THEN A DREAM : AN ESSENCE

Ipsita Paul
Semester-V ● English (Hons)

Spotlight on the girl, please ....
'Mama' 'Mama' the backyard, the oven, the cook
It's all ruined, come look'

'Papa' Papa' 'hop me up, please
I don't want to walk anymore'

'Mama' 'Mama' 'the twinkling lights
Please hang the twinkling lights'
Funny!! Everything is so typical, it's funny
Haha Haha
'Have you eaten all day?

Then there was that groan, again that same groan.
'Hello there! Beautiful, niece! 'You've grown
Oh! You were so small just yesterday
And tiny bosom'
The eyelids didn't flutter when the words came out
No! This time they didn't, no they didn't
They wouldn't
They just couldn't believe
Those fingers had grazed over her for sometime
Once upon a time ....
They eyelids remember now, they do now,
Yes! Yes, Huh, Yes, That has happened.
It was it how it had happened.

'Uncle uncle!!' 'Could you please come here
And see why the grill is so back?'
Out came the stomping body
On the wet grass. In the backyard,
Stomp
Stomp
Stomp.

'It's fine!' .... (No it wasn't) ...
Something happened
The eyelids remember it now
The elongated engulfing palms planted on her little torso
And pressed his thumbs each
Caressing each of her teeny tiny cottony nipples
Blew raspberries against her belly button
She shrieked
Her eyes stung. It's the salt from her tears.
Though fewer eyelids were batted at the nuance-
But-Oh! Such a plaything ...
The nuance didn't stop
Nor did the shrieking
Nor did the crying.
He was no papa.
She didn't ask him to hop her up
Papa, Papa. She needed Papa
Papa wasn't around,
But this gobbler sure was
Always.

I slimily slipped through the snaky-handy cage
I ran
I ran
I ran
And only halted after colliding and dropped down
Another huge body
But soft enough-familiar enough
It was my mama
Yes, my mama. My eyelids knew her,
I was safe.
'Mama' 'Mama' 'the backyard ...'
'The place (-that place), the memory, the person (-the cook)
It's all ruined, don't look.'

Only the distant, hideous laugh loomed there after
Haha Haha Haha!
... The camera focuses on the girl and shuts off.